এক যে ছিল রাজা

দীপক চৌধুরী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা এলাহাবাদ বোম্বাই

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

পাতালে এক ঋতু

শঙ্খবিষ

কুমারী কন্যা

এই গ্রহের ক্রন্দন

রোয়াক

দাগ

ফরিয়াদ

মনের মধ্যে মন

'A truth is a truth in so far as it is believed.'

সেকালের ঝানু বিপ্লবী ছিলেন গজানন মুখুজ্জে। পিস্তল-বোমা ছুঁড়েছেন আবার গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনেও যোগ দিয়েছেন। আমোদ-আহ্লাদ করার ফুরসত ছিল না তাঁর। সেবার হাজারীবাগের জেলে ব'সে খবর পেলেন, তাঁর নিজের গ্রাম ফতুল্লায় নাকি বিরাট ব্যাপার চলেছে। বিপিন চাটুজ্জের বউ স্বপ্ন দেখেছেন তাঁদের গোয়ালের পেছন দিকে এক সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। বিপিন চাটুজ্জেকে তিনি চিনতেন। পুলিশের টিকটিকি ছিলেন। বিপ্লবীদের যাওয়া-আসা সম্বন্ধে খবর পৌঁছাতেন পুলিশের কাছে। গজানন মুখুজ্জের বিশ্বাস ছিল, হিন্দুর দেবদেবীরা বাংলার বিপ্লব-আন্দোলন সমর্থন করেন। হাজারীবাগের জেলে ব'সেই বিস্মিত বোধ করলেন তিনি। তবে কি হাওয়া পাল্টে গিয়েছে? দেবদেবীবা কি বাংলার বিপ্লববাদ আর সমর্থন করেন না? সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা দেবী তা হ'লে বিপিন টিকটিকির বাড়িতে এসে আবির্ভূতা হলেন কেন? খবর পাওয়ার পর থেকে নানা রকমের সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগলেন তিনি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে অতো অল্প বয়সে দেশোদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন …অস্থিরভাবে দিন দুই কারাকক্ষে পায়চারি করলেন। উনিশ-শো ন' সালের কথা মনে পড়ল। বছর দশেক বয়স ছিল তাঁর। আশুতোষ বিশ্বাস ছিলেন কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটার। নরেন গোঁসায়ের খুনের মামলায় তিনি ছিলেন সরকারপক্ষের উকিল। ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁকে হত্যা করা হয়। হত্যা করেছিল বিপ্লবী চারুচন্দ্র বসু। দেশকে কী ভীষণ ভালবাসত চারুচন্দ্র! তার ডান হাত ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অন্য হাত দিয়ে ঘোড়া টিপেছিল সে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। রিভলভার ছোঁড়ার প্র্যাকটিস ছিল না। ভগবান তাকে সাহায্য করেছিলেন। পাবলিক প্রসিকিউটার আশু

বিশ্বাস পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। গল্প শুনে গজানন মুখুজ্জে সেই দিনই বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

ফতুল্লায় গিয়ে ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখা দরকার। হাজারীবাগ জেল থেকে পালাবার পথ তৈরি করতে লাগলেন তিনি। জেলের মধ্যে জলসার আয়োজন হ'ল। গানবাজনা তো হবেই, সেই সঙ্গে হাসিকৌতুকের ব্যবস্থাও হ'ল। রাজবন্দীদের মধ্যে তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভাব ছিল না। সুপতি পাকড়াশী ছিলেন ক্যাম্প-জীবনের রসকেন্দ্র। জলসার রাত্রে প্রহরীরাও গানবাজনার মধ্যে ডুবে গেল। সেই সুযোগে প্রাচীর টপকে পালিয়ে গেলেন গজানন মুখুজ্জে। ধুতিটা কাঁটাতারের সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। নাভির ওপর থেকে গিঁট খুলে ফেললেন। কাপড়টা ওখানে প'ড়ে রইল। শুধু আণ্ডারওয়ার প'রে তিনি ছুটতে লাগলেন। গয়া রোডের ধারে দলের একজন বিপ্লবীর এসে অপেক্ষা করার কথা। সঙ্গে ক'রে সে একটা বোরখা নিয়ে আসবে। কিন্তু কই কেউ নেই তো! কনকনে ঠাণ্ডা, মাঘ মাসের মাত্র তিন তারিখ আজ। গয়া রোডের উল্টো দিকে খোলা মাঠ। দু'ব্যাটারীর টর্চলাইট মারলে পুরো মাঠটাই দেখা যায়। মাঠের পশ্চিম-দক্ষিণ কোনায় ক্যানারী পাহাড়। কিন্তু মাঠের ওপর দিয়ে শর্ট-কাট ধরলেও মাইল দুই হাঁটতে হবে। লুকনো দরকার। গয়া রোডের ধারে শুধুমাত্র আণ্ডারওয়ার প'রে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। গাছের ওপর উঠে বসলেন গজানন মুখুজ্জে।

কাঁপুনি আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এতোক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবী চারুচন্দ্র আর ক্ষুদিরামের নাম স্মরণ ক'রে শরীরটাকে গরম ক'রে রেখেছিলেন। আর পারছেন না। ক্যানারী পাহাড়ের দিক থেকে মন্দমধুর হাওয়া আসছে। গাছের ডালে ব'সে ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত মনে মনে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র জপতে লাগলেন।

বোরখা নিয়ে দলের লোক এসে উপস্থিত হ'ল। ঝুপ ক'রে গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লেন তিনি। বললেন, "তুমি আধ ঘণ্টা লেট করেছ। মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য নেপোলিয়ন—"

"কি করব, গয়া রোডের মোড়ে গুটি-পাঁচেক টিকটিকি পাহারা দিচ্ছে।"

বোরখা প'রে গজানন মুখুজ্জে ফতুল্লা গাঁয়ে এসে উপস্থিত হলেন। চতুর্দিকেই লোকের ভিড় দেখলেন। বিপিন চাটুজ্জের বাড়ির দিকেই যাচ্ছে সবাই। পথের মাঝখানে দেখা হ'ল হরিনারায়ণ চক্কোত্তির মেয়ে পারুলবালার সঙ্গে। পারুলকে তিনি ভালবাসতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি ওকে বিয়ে করবেন ব'লে কথা দিয়েছেন। পথের মধ্যে পারুলকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ওর দিকে। যতো এগিয়ে যান, পারুল ততো স'রে যায় দূরে। গলায় বিরক্তির ঝাঁজ মিশিয়ে সে বলল, "আ ম'লো যা! সাজিতে ফুলবেলপাতা দেখতে পাচ্ছিস না? ছুঁয়ে দিবি নাকি?"

"পারু, আমি মোচলমান নই—আমি—আমি—তোমার গজুদা—"

"গজুদা!"

"বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে এসেছি।"

ওইখানেই ব'সে পড়ল পারুলবালা। বোরখা-পরা গজানন মুখুজ্জের পায়ের ওপর একমুঠো ফুলবেলপাতা রেখে প্রণাম করল।

সেই সময় কোথা থেকে বিপিন চাটুজ্জে এসে উপস্থিত হলেন ঐখানে। চমকে উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "জাতজন্ম সব খোয়ালি? মোচলমানের পায়ে পেন্নাম করলি কেন?"

"না মেসোমশাই, এ যে সেই জয়নগরের কালীসাধক ছকু পীরের বিবি!"

"এখানে কেন?"

"তোমার ওখানে জগদ্ধাত্রী দর্শনে যাচ্ছেন।"

"সে তো আজ সকালে কলকাতার জাত্নঘর থেকে লোক এসে কিনে নিয়ে গিয়েছে।"

"কতোতে বেচলে ?"

"জাত্নঘরের লোকেরাই বললে চারশো বছরের পুরনো মূর্তি। এক-এক শতাব্দীর জন্য একশো টাকা। মোট চারশো পেলুম।" বিপিন চাটুজ্জে দূরে দাঁড়িয়েই মাথাটা একটু নিচু করলেন। বোরখাটা ন'ড়েচ'ড়ে উঠল একটু। এই অঞ্চলে ছকু পীরের নাম খুব। তাঁর বিবিকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করতে ভয় পেলেন তিনি। বিপিন চাটুজ্জে চ'লে যাওয়ার পর পারুলবালা বলল, "বোরখাটা একটু খোলো না, গজুদা, তোমায় দেখি।"

"কি ক'রে খুলব, ভেতরে যে শুধু আণ্ডারওয়ার!"

বোরখার পাশে গল্প করতে করতে পথ এগুতে লাগল পারুলবালা। মনে মনে গর্ব হচ্ছে খুব। ওকে দেখবার জন্য বন্দী-শিবির থেকে গজুদা পালিয়ে এসেছেন। দেশপ্রেম তাঁর অগাধ, তাই ব'লে পারুল-প্রেম তাঁর কম নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, "একটা কথা আমার রাখবে, গজুদা ?"

"কি ?" বোরখার তলা থেকে জানতে চাইলেন গজানন।

"আমাকে দেখবার জন্য যখন ছুটে আসতে পারলে তখন বিয়েটা শেষ ক'রে যাও। তোমার দলের লোক গদাই মুন্সির বাড়ি—"

বাধা দিয়ে গজানন মুখুজ্জে জিজ্ঞাসা করলেন, "গদাই মুন্সি যে আমাদের দলের লোক তুমি জানলে কি ক'রে পারু ?"

"জানি—আমার কাছে একটা পিস্তল রেখেছে·· "

"পিস্তল ?"

"হ্যাঁ, সের পনরো ওজন হবে। এক তাল লোহা—মনে হয় কামারশালায় পিটে পিটে সামনের দিকটায় একটা নল বার করেছে। ছুঁড়ে মারলে পুলিশের মাথা ফাটতে পারে। তুমি তো

গদাই মুন্সির বাড়ির দিকেই পথ ধরলে···দলের লোকদের বলো পুরুত ডেকে বিয়েটা গোপনে শেষ ক'রে ফেলতে।"

"কিন্তু দেশ থেকে সাদা চামড়াদের বিদায় না ক'রে তো বিয়ে করতে পারি না।" গজানন মুখুজ্জে সহসা উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। বোরখাটা প্রায় প্রকাশ্য দিবালোকে খুলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পারুলবালা সতর্ক ক'রে দিয়ে বলল, "এই, এই করছ কি! সামনের দিকটা, মানে তুমি তো মেয়েমানুষ সেজেছ—মানে বাইরের লোকেরা দেখলে যেন বুঝতে পারে তুমি স্ত্রীলোক।···গজুদা, তোমার কাজে আমি কোনোদিনও বাধা দেবো না।"

"ধরো, বিয়েব পরে যদি আর কোনোদিনও দেখা না হয়?"

"কাঁদব, কিন্তু দেশের কাজ করতে বারণ করব না তোমায়।"

"অপেক্ষা করতে পারবে পারু?"

"পারব।"

"আজকের রাত্রিটা ভেবে দেখো।"

"ভাববার আর সময় নেই, গজুদা। পুলিশ তোমায় নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরিয়েছে। তারা এখানেও আসবে। বিপিন চাটুজ্জে তোমায় দেখে ফেলতে পারে—"

"এবার ঐ টিকটিকিটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে তবে পুলিশের হাতে ধরা দেব আমি।" গজানন মুখুজ্জে গদাই মুন্সির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঘষলেন।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল পারুলবালা। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল? কাঁদছ কেন?"

"তোমার যে তা হ'লে ফাঁসি হবে।"

"এই সেরেছে! ভিড় জমিয়ে ফেলবে নাকি? থামো, থামো, পারু। গদাই কি বলে শুনে নিই। আজ রাত্রেই তোমায় খবর পাঠাবো।"

"বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আমি নিজেই চ'লে আসব, খবর পাঠাতে

হবে না।" পারুলবালা ফুলের সাজি হাতে নিয়ে হেলতে দুলতে হাঁটতে লাগল বিপিন টিকটিকির বাড়ির দিকে। দু'তিনটে দিন অন্তত তাঁকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

দু'দিন পরেই গজানন মুখুজ্জে গোপনে পারুলবালাকে বিয়ে করলেন। পুরোহিত যিনি এলেন তিনিও দলের লোক। বিয়ের পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই গজানন ডাকলেন, "পারু, ও পারু— বাব্বা! এ যে দেখছি কুম্ভকর্ণকেও হার মানায়। বলি—ও পারু—" সজোরে ধাক্কা মারলেন পারুলবালার গায়ে।

"কি হয়েছে?" ধড়ফড় ক'রে উঠে বসল পারুলবালা।

"মন বলছে, 'এক্ষুনি পালাও। আমি চললুম--"

"দাঁড়াও—" বিয়ের চেলিটা টেনেটুনে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে পারুলবালা বলল, "বাসী-বিয়ের কি হবে?"

"আসলটা তো শেষ হয়েছে। যজ্ঞি পর্যন্ত করিয়ে নিলে কাল। দাও, আমার বোরখাটা দাও। পারু, জীবনে যদি আর দেখা না হয় দুখ্যু কোরো না।"

বোরখা পরলেন গজানন। গদাই মুন্সিকে ডাকতে গেলেন পাশের ঘরে। পৌঁছতে পারলেন না। বাড়িটা ঘেরাও করেছে পুলিশ। টের পেয়ে পারুলবালা বেরিয়ে এল বাইরে। দারোগা-সাহেবকে বলল, "খবরদার গায়ে হাত দেবেন না—ইনি হচ্ছেন ছকু পীরের বিবি!"

"বটে? দেখি, ছকু পীরের বিবি দেখতে কেমন?" দারোগা-সাহেব বোরখাটা নিজের হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন একধারে। বিপ্লবী গজানন মুখুজ্জে ধরা পড়লেন বাসী-বিয়ের দিন। সেই সঙ্গে গদাই মুন্সিব হাতেও হাতকড়া পরল। বিয়ের চেলি প'রে সামনের দিকে চেয়ে রইল পারুলবালা।

স্বামীর সঙ্গে জীবনে আর কোনোদিনও দেখা হয়নি।

ধরা পড়েছিলেন উনিশ-শো বত্রিশ সালে। তারপর আটচল্লিশ

সাল পর্যন্ত একটানা বন্দীজীবন কাটাতে হয়েছে। কখনো রাজবন্দী, কখনো কয়েদী। তিন বছর জেল খেটে পথে বেরুলেন, বাড়ি পৌঁছবার আগেই আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। বিনা বিচারে কিছুকাল আটক থাকবার পর বাইরে বেরিয়ে শুনতে পেলেন গান্ধীজীর আন্দোলন শুরু হ'য়ে গেছে। দেরি করলেন না গজানন মুখুজ্জে। কাঁথির দিকে রওনা হ'য়ে গেলেন। আবার গিয়ে জেলে ঢুকে পড়লেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। এবারের অভিযোগটা ছিল অত্যন্ত গুরুতর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শুরু হয়েছে। তাঁকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। এখানে এসেই পরিচয় হয় দুলাল দত্তের সঙ্গে। ছোকরা ভারি চালাক। ইতিহাস-রাজনীতি সম্বন্ধে বই পড়েছে অনেক। কি ক'রে দেশকে ভালবাসতে হয় সে-সম্বন্ধেও মাঝে মাঝে লেকচার দেয় সে। দুলালের লেকচার শুনে গজানন বলেন, "তা হ'লে যে সারাটা জীবন এতো কষ্ট পেলুম তার কোনো সার্থকতা নেই?"

"কিচ্ছু না। যতোক্ষণ পর্যন্ত লীডার না হ'তে পারছ ততোক্ষণ পর্যন্ত সব ফাঁকা, সবই বুজরুকী। গজুদা, দেখি, তোমার হাত দেখি—" ফস ক'রে হাতটা টেনে নিল দুলাল।

গজানন বললেন, "হাত দেখে আর কি করবি, বয়স তো প্রায় পঞ্চাশ হ'তে চলল।"

"তা হোক, যতোক্ষণ শ্বাস ততোক্ষণ আশ। এই সেরেছে!" গজাননের ডান হাতের চেটোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে দুলাল দত্ত ব'লে উঠল, "এ যে সংঘাতিক ব্যাপার! মাইরী বলছি গজুদা, লীডার-ফিডার নয়, তুমি রাজা হবে। দেখি, কপালটা দেখি তোমার—" হাতের চেটো ছেড়ে দিয়ে দুলাল এবার গজাননেব কপাল দেখতে লাগল, "হ্যাঁ, ভুল করিনি। রাজটীকা চামড়ার ওপর ভেসে ওঠেনি বটে, কিন্তু আছে।"

"কোথায় আছে?"

"চামড়ার তলায়। একদিন-না-একদিন ভেসে উঠবেই—দেখে নিয়ো। গজুদা, যদি রাজা হও তা হ'লে আমায় কিন্তু মন্ত্রী করতে হবে।"

"মন্ত্রী কি রে, তোকে আমি প্রধানমন্ত্রী করব। তুই হবি আমার দক্ষিণ বাহু। ছ্যাখ্ তো দুলাল, পটলীর ভাগ্যটা কিরকম। সময়টা ওর এখন কেমন যাচ্ছে?"

পটলী হচ্ছে গজানন মুখুজ্জের মেয়ে। তাকে তিনি আজও দেখেননি। পারুলবালা মারা গিয়েছে। জনার্দনপুরে এক পিসির কাছে আশ্রয় পেয়েছিল পটলী। মাঝে মাঝে তার কাছ থেকে চিঠিপত্র পান গজাননবাবু।

দুলাল দত্ত হাতের রেখা দেখে বলতে লাগল, "আহা, মা নেই, বাবাও আন্দামানে! চোদ্দ বছর চলছে, পনরোয় পড়ল ব'লে। পিসির কাছে আছে···আহা, কী সুন্দর নাম—পটলী! তোমার মতো যদি গায়ের রং পেয়ে থাকে, তা হ'লে তো দুধে-আলতায়···"

"ওর পিসিমা একবার লিখেছিলেন—আমি তখন ঢাকা জেলে—লিখেছিলেন, পারুর মতো পটলচেরা চোখ পেয়েছে মেয়েটা।" আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন গজানন।

দুলাল বলল, "তাই তো দেখছি···গজুদা, ব্যাপার কি বলো তো? ওঁরা কি আমাদের কথা ভুলে গেলেন নাকি?"

"অসম্ভব নয়, দূরে আছি তো। তা ছাড়া ইংরেজ ব্যাটারা এতো বড় বদমাইশি করবে ওঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন?"

"ইংরেজ কি বদমাইশি করল? তারা তো শুনলুম স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য লীডারদের দরজায় দরজায় ধর্না দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত দিলে তো, একরকম জোর ক'রেই চাপিয়ে দিলে।"

গজাননের মুখে মৃদু হাসি, "একেই তো বলে রাজনীতি। যখন চাইলুম দিলে না। যখন দিলে তখন চাইলুম না। সাত-তাড়াতাড়িতে ঘর গুছচ্ছেন ওঁরা—পাকড়াশীদা আমাদের ভুলবেন না।"

"পনরোই আগস্ট থেকে হিসেব ক'রে গ্যাখো ন' মাস পার হ'য়ে গেছে।"

"মন্দ লাগছিল না এখানে—চারদিকে সমুদ্র, মাঝখানটায় জঙ্গল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে করবি কি?"

"দিন সাতেক তো শুধু মাতলামি ক'রে বেড়াব। কালী-মার্কা পান করব আর বাংলা ফিল্ম দেখব। গজুদা, তুমি কিন্তু সোজা জনার্দনপুর চ'লে যাবে—থাকবে কোথায়?"

"সেজন্য ভাবনা নেই, পাকড়াশীদা সব ঠিক ক'রে দেবেন। বালিগঞ্জের দিকটা মন্দ নয়। কি বলিস?"

দুলাল দত্ত কিছু বলল না। বেড়াতে বেরিয়ে গেল সে। খানিকটা দূর এগিয়ে যেতেই পুবের সমুদ্র চোখে পড়ল ওর। জীবনের সাতটা বছর এখানে কেটে গেল! ভারতবর্ষের তাতে কোনো লাভ হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে দুলাল আজ সঠিক ক'রে কিছু বলতে পারে না। নিজের লোকসান কম নয়। যৌবনের মহামূল্যবান সাতটা বছর সমুদ্রের লবণাক্ত জল লেগে লেগে শুধু ক্ষ'য়ে গেল। মুক্তির দিনটিতে পর্যন্ত ভারতবর্ষের কেউ আর ওদের কথা মনে করল না!

॥ দুই ॥

মনে করতে সময় লাগল প্রায় দশ মাস। দু'একটা ফাইল ওলটপালট হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে এদের নাম-ঠিকানা খুঁজে পেতে দেরি হয়েছে। দুলাল বললে, "বুঝলে তো গজুদা, আমরা এখন বেঁচে আছি শুধু গভর্নমেণ্টের ফাইলে।"

"ফাইল থেকেই তো ইতিহাসের পাতায় গিয়ে আশ্রয় নেব রে।"

"ইতিহাসের পাতায়? মাথা খারাপ তোমার! এবার তল্পিতল্পা গুটোও—জাহাজে উঠতে হবে।"

গুটোবার মতো জিনিসপত্র বিশেষ কিছু ছিল না। গজানন মুখুজ্জে গেরুয়া রঙের খদ্দরের লুঙ্গি পরলেন। গায়ে ফতুয়া। পুরনো আমলের একটা গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ জমা রেখেছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। সেটা আছে। ভেতরে রাখবার মতো বিশেষ কিছু ছিল না। গুটি দুই আণ্ডারওয়ার, একটা ল্যাঙট—আর সাত দিনের জন্য সাতটা নিমের দাঁতন সংগ্রহ ক'রে নিলেন। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম দরকার হয় না তাঁর। গোঁফ-দাড়ি ছাটবার জন্য একটা কাঁচি রাখলেই কাজ চ'লে যায়। সেটা আছে।

সকালবেলায়ই জাহাজে চাপতে হবে। গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ থেকে গান্ধীটুপীটা বার ক'রে মাথায় পরলেন গজাননবাবু। রওনা হওয়াব আগে দুলালকে দেখতে পেলেন না তিনি। দু'একবার নাম ধ'রে ডাকলেন, সাড়া পেলেন না ওর।

ঘরের বাইরে এসে দেখলেন, দুলাল প্রাণপণে এদিকেই ছুটে আসছে। তাঁর পেছন ধরেছে সেই গণ্ডাবেব বাচ্চাটা। হাঁফাতে হাঁফাতে দুলাল বলল, "কিছুতেই পারলুম না, দাদা—জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে কচি কচি নটে-শাক খেতে দিলুম। ভাবলুম, নটে-শাক নিয়ে ম'জে থাকবে, কিন্তু যেই আমি উল্টোদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছি অমনি দেখি সেও ঘুবে দাঁড়ালো। ছুটতে লাগলুম, সেও পেছু নিল। এক বছরের বাচ্চা, অথচ কী সাংঘাতিক বুদ্ধি! ঠিক বুঝতে পেবেছে, আমরা আন্দামানে আর থাকব না। এইজন্য তুমিই দায়ী।"

"আমি? আমি কি করলুম? গণ্ডারের বাচ্চা নিয়ে এতো বেশি না মজলেও পারতিস। গোড়াতেই বলেছিলাম, মায়া বাড়াস্‌নে দুলাল, প্যাঁচে পড়বি। গণ্ডার কিনা, এখন লাথি মারলেও ছাড়তে চাইবে না। ওর তো কিছু দোষ আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"দোষ তোমার। কাল থেকেই তুমি গান্ধীটুপী প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ও ঠিক বুঝতে পেরেছে আমরা কলকাতা যাচ্ছি। এখন কি করি পরামর্শ দাও, গজুদা।"

"তা হ'লে চলুক সঙ্গে। ভারতবর্ষে গিয়ে যদি হাঙ্গাম বাধায়, তা হ'লে আমরাও ওকে ফ্যাসাদে ফেলব। পাঠিয়ে দেবো চিড়িয়াখানায়। তুই আয়, আমি একবার জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা ব'লে রাখি। ভাড়া-টাড়া তো দিতে পারব না—ব্যাটা আবার আপত্তি ক'রে বসতে পারে। আসবার সময় গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা নিয়ে আসিস।"

গজানন মুখুজ্জে জাহাজঘাটের দিকে রওনা হ'য়ে গেলেন। একটু আগে যাওয়া ভালো। দশ মাস হ'ল ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু জাহাজের ক্যাপটেন এখনো ইংরেজ। ক্যাপটেন ড্রেক। কুকুরের বাচ্চা হ'লে ব্যাটা কোলে নিয়ে চুমু খেত। বিনা ভাড়ায় আউটরাম ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে দ্বিধা করত না। গণ্ডারের বাচ্চা ব'লেই আপত্তি করতে পারে ক্যাপটেন ড্রেক। গান্ধীটুপীটা মাথার ওপর চেপে বসিয়ে দিলেন ভালো ক'রে। দরকার হয় জাহাজঘাট থেকেই নতুন সংগ্রাম শুরু করবেন তিনি। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ভয় পাওয়ার লোক তিনি নন। গজানন মুখুজ্জে ভেটারেন বিপ্লবী। সুপতিদা-কে টেলিগ্রাম করবেন। ক্যাপটেন ড্রেকের চাকরি খতম ক'রে দিতে একটা টেলিগ্রামই যথেষ্ট। গণ্ডারের বাচ্চা কুকুরের বাচ্চার চেয়ে খারাপ নাকি? তুমি যদি বলো খারাপ, আমি বলব ভালো। ঢের ভালো। কুকুর মাংস খায়, আমাদের গণ্ডারের বাচ্চা নটে-শাক খায়, কচি কচি ঘাস খায়। খাঁটি ভারতীয়। নিজের মনেই হাজার রকমের যুক্তি খাড়া করতে লাগলেন তিনি। দুলাল সঙ্গে এলেই বোধ হয় ভালো হ'ত। গণ্ডার সম্বন্ধে দুলালের পাণ্ডিত্য অসাধারণ। অথচ এই তো মাত্র সেদিন গণ্ডারের বাচ্চাটা ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কোথা থেকে এল, কেন এল কিছুই জানা যায়নি। মাতৃপিতৃকুলের পরিচয় অজ্ঞাত। আন্দামানের আদি অরণ্যে গণ্ডার নেই। পুরনো কয়েদী কিংবা আন্দামানের বাসিন্দে কয়েদীরাও এর অতীত কিংবা

বর্তমান জীবন সম্বন্ধে কোনো খবরই জানে না। তবুও এই অজ্ঞাত-কুলশীল গণ্ডারটি ভারতীয় সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। চামড়া মজবুত। হাজার বছরের দাসত্ব-কিল্বিষও গায়ে লাগেনি ওর। সে ভালবাসতে জানে। এক পলকের জন্যও দুলালকে ছাড়তে চায় না। চব্বিশ ঘণ্টাই ওর পায়ের সঙ্গে লেগে লেগে থাকে। এই অল্প বয়সেই চামড়া মজবুত হয়েছে। একদিন রেগে গিয়ে দুলাল লাথি মেরেছিল। আর একটু জোরে মারলেই দুলালের পা যেত মচকে। ভারতবর্ষের বাজারে এমন জন্তুর সংখ্যা হয়তো কম নয়। তা হোক, একটা ছোট বাচ্চা যদি পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারে তা হ'লে রেশন-কার্ডেরও দরকার হবে না। একটা নেড়ীকুত্তার জন্যেও কি খরচ কম? জাহাজে এসে ক্যাপটেন ড্রেকের অনুসন্ধান করতে লাগলেন গজানন মুখুজ্জে।

এদিকে বক্‌লস খুঁজছিল দুলাল। রওনা হওয়ার মুহূর্তে যতো সব ঝামেলা! ছ বছর আট মাস পরে ভারতবর্ষে ফিরছে—কতো রকমের ভাবনাচিন্তা। স্বাধীনতার দশ মাস পরে কে কোথায় আছে, কে কি করছে কিছুই ওর জানা নেই। নিজের ভবিষ্যৎ রঙীন, না অন্ধকার, তাও তো কিছু জানে না দুলাল। গজুদার তো পাকড়াশী-দাদা আছেন, কিন্তু দুলালের কে আছে? দলের বন্ধুদের নামগুলোও আজ স্পষ্ট মনে নেই। যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁদের কথা ভেবে লাভ কি? তাঁরা তো গোড়া থেকেই প্রতিষ্ঠিত। গুলী ছোঁড়েননি, গুলী তাঁদের গায়েও লাগেনি।

বক্‌লস পাওয়া গেল না। কয়েদী ওমরাও খাঁ নারকোলের দড়ি কেটে বক্‌লস তৈরি ক'রে দিল। চিহ্ন একটা থাকা দরকার। কলকাতার ভিড় বড় সাংঘাতিক! হারিয়ে গেলেও ওকে খুঁজে বার করতে পারবে দুলাল। গণ্ডারের গলায় দড়ির বক্‌লস পরিয়ে দিল ওমরাও খাঁ। দিয়ে বলল, "সেলাম। শালার ভাগ্য ভালো। পয়দা হ'ল আন্দামানে, জীবন কাটাবে হিন্দুস্থানে। আমাদের ঠিক

উল্টো।” কপালে করাঘাত ক'রে ওমরাও খাঁ দুলালকে জিজ্ঞাসা করল, “বাবুরা তো মন্ত্রীটন্ত্রী নিশ্চয়ই হবেন?”

“ঠিক নেই কিছু—” গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা হাতে তুলে নিল দুলাল। নিজের জিনিসপত্র যা ছিল সব সে ভ'রে নিয়েছে একটা ঝোলার মধ্যে। ঝোলাটা ঘাড়ের একদিকে ঝুলে রয়েছে। চোখে-মুখে কেমন যেন একটা উদাস-উদাস ভাব। ভারতবর্ষের উপকূলে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার তাগিদ কিছু অনুভব করতে পারছে না। অনিশ্চয়তার কুয়াশা ঘন।

ওমরাও খাঁ বলল, “মন্ত্রীটন্ত্রী যদি হন তা হ'লে আমাদেরও খালাসের ব্যবস্থা করবেন, বাবু।”

“কতোদিন হ'ল?”

“বছর সাতেক।”

“খুন, না ডাকাতি করেছিলে?”

“খুন।”

“ক'টা?”

“একটা। নিজের বিবিকেই।”

“কেন?”

দুলাল হাঁটছিল। খুনের জন্যই অনেকে এখানে নির্বাসনে আছে তা সে জানে। গায়ে প'ড়ে কোনোদিনও কাউকে প্রশ্ন করতে যায়নি। আজও কিছু দরকার ছিল না প্রশ্ন করার। শুধু চ'লে যাওয়ার মুহূর্তটাকে মধুর করবার উদ্দেশ্যেই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, “বিবির কি কসুর ছিল?”

“ইংরেজ পুলিশ-সাহেবের কি কসুর ছিল? খুন করতে তো গিয়েছিলেন বাবু, গুলীটা লাগেনি। বাবু—”

দুলাল দণ্ড কয়েক পা দূরে স'রে গিয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, “দেখি, মন্ত্রীটন্ত্রী যদি হওয়া যায়···”

অনুরোধ করতে হ'ল না, প্রস্তাব পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপটেন ড্রেক গজাননবাবুকে বললেন, "ও! হী ইজ এ ডারলিং! নিয়ে এসো, নিয়ে এসো। রাইনো আমার প্রিয় জন্তু···ছুটিতে একবার দক্ষিণ রোডেশিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিলুম···মিস্টার মুখার্জী, গোটা চার রাইনো আমার গুলী খেয়ে মারা যায়···একটা তো আমায় পাঁচ গজ দূর থেকে চার্জ করেছিল···মিস্টার মুখার্জী, আই থিঙ্ক, তুমি নিশ্চয়ই গ্যাণ্ডীজীর একজন রাইটহ্যাণ্ড ম্যান?"

মুখুজ্জেমশাই এমনভাবে হাসলেন যা থেকে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' কিছুই ধরতে পারা গেল না। তাতেই কাজ হ'ল। খাতির ক'রে নিজের কেবিনে নিয়ে গেলেন তিনি। কফি আনবার অর্ডার হ'ল। সুন্দরভাবে সাজানো-গুছনো ঘরখানা। চোখ বন্ধ ক'রে হঠাৎ এখানে ঢুকে পড়লে মনে হবে না কামরাটা জলের ওপব ভাসছে। মার্বেল-কাগজ দিয়ে দেয়াল চারটে মোড়া। দেয়ালের গায়ে ফিল্ম-তারকাদের ছবি। মুখুজ্জেমশাই কাছে এগিয়ে গিয়ে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। বিলেতী স্টার। ঠাণ্ডার দেশ—কিন্তু গায়ে এদের জামাকাপড় নেই কেন? ঘাড়ের দু'দিকে দুটো সরু সরু ফিতে। ফিতের মুখে এক টুকরো নেকড়া সূক্ষ্মভাবে সেলাই করা। মেমসাহেবরা তো গাউন পরেন। এরা কি পরেছে? ল্যাঙট নাকি? তাঁর নিজের ল্যাঙটেও কাপড়ের পরিমাণ এদের চেয়ে অনেক বেশি। ক্যাপটেন ড্রেক বুড়ো হয়েছেন বটে, কিন্তু লজ্জাশরম ব'লে কিছু নেই, ভাবলেন গজাননবাবু। ঘরের একদিকে ছোট্ট একটা শেল্ফ। তিনটে তাক। তলাব তাকে ক'খানা বই—বাকী দুটো তাকে ফিল্মের ম্যাগাজিন। পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষায় যতোগুলো ম্যাগাজিন ছাপা হয় সবই এখানে পাওয়া যায়। দু'একখানা কাগজ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন। মলাটের ওপর রং-বেরঙের স্ত্রী-দেহ।

কফি এসে গিয়েছে। মাথার টুপীটা খুলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ

ঠাণ্ডার দেশ—কিন্তু গায়ে এদের জামাকাপড় নেই কেন

তাঁর মনে হ'ল, টুপীটা খুলে ফেললে ক্যাপটেন ব্যাটা হয়তো আর খাতির করবে না। এই সময় দুলাল এসে দরজার ওপাশ থেকে ডাকল, "গজুদা, আছো নাকি ?"

"আ·ম'লো যা! তুই আবার এখানে মরতে এলি কেন? পালা, পালা—"

"কেন ?" বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করল দুলাল।

"তুই ছেলেমানুষ, এখানে ঢুকিস্‌নি—"

"কেন গজুদা ?"

"আরে এটা যে গণিকালয় !"

"তা হ'লে তুমি ঢুকেছ কেন ?"

"ভুল ক'রে।"

"আমিও ভুল ক'রে ঢুকব—"

ক্যাপটেন ড্রেক জিজ্ঞাসা করলেন, "ইওর ফ্রেণ্ড ?"

"হ্যাঁ।"

"লীডার ?"

দুলাল ঢুকে পড়ল কেবিনের মধ্যে। সামনের দিকে চেয়েই সে অবাক হ'য়ে গেল। বললে, "তুমি বিস্কুট খাচ্ছ, গজুদা ? আমিও খাব।" প্লেট থেকে একখানা বিস্কুট তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কই, গণিকারা সব কোথায় ?"

"দেয়ালে···আর ঐ সব মলাটগুলো ছাখ্‌···" দুলালকে দেখতে ব'লে ছবিগুলো দেখতে লাগলেন তিনি নিজেই।

ক্যাপটেন ড্রেক দুলালকে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

চেয়ারে ব'সেই থাবা মেরে গোটা-চার বিস্কুট একসঙ্গে তুলে নিল সে। নিয়ে বলল, "গজুদা, তুমি ছবিই দেখবে, না বিস্কুট খাবে ? পরে কিন্তু আমায় দোষ দিয়ো না।" প্লেটটা প্রায় পরিষ্কার ক'রে ফেলল দুলাল। কণ্ঠনালী দিয়ে আর আওয়াজ বেরুচ্ছে না, পুরো পথটাই বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে ভর্তি!

শূন্য প্লেটের দিকে চেয়ে গজাননবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "করেছিস কি ?"

"কি করব, বিলেতী বিস্কুট যে!" এক পেয়ালা কফি এক চুমুকে শেষ ক'রে ছুলালই বলল, "একটা জাত বটে এরা! কবিতাই বলো আর বিস্কুটই বলো প্রত্যেকটা জিনিসই একেবারে রসে টইটুম্বুর। এদের তাড়িয়ে দিয়ে বোধ হয় ভালো করলে না।"

"ও কি হচ্ছে ?" গজানন মুখুজ্জে ছুলালের হাতটা চেপে ধ'রে বললেন, "এক কেটলী কফি তুই একাই খাবি ? রাখ্, কেটলীটা তুই আর ছুঁতে পারবি না। তোর রসের গল্প আমরা পরে শুনব।"

কেটলীটা ছেড়ে দিল ছুলাল। চোখ ছুটো ওর ছলছল করতে লাগল। মাথা নিচু ক'রে সে বলল, "আর একটু হ'লে কব্জিটা আমাব ভেঙে যেত। ল্যাঙট প'রে প'রে তুমি না-হয় স্ট্রং রয়েছ··· আরে ওটা কি ?" ছুলাল দত্ত উঠে পড়ল। ঘরের এক কোনায় একটা ঢাকের মতো কি দেখা যাচ্ছে ? ক্যাপটেন ড্রেকের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "এটা বুঝি সেই সপ্তদশ শতাব্দীর ক্যাপটেন ড্রেকের ড্রাম ?"

"হ্যাঁ, তারই সিম্বল্ এটা। তুমি কি ক'রে জানলে ?" খুবই অবাক হ'য়েছেন ক্যাপটেন ড্রেক।

গর্বে গজানন মুখুজ্জের এবার চওড়া বুকটা আরও বেশি চওড়া হ'ল। তিনি বললেন, "মিস্টার দত্ত তোমাদের দেশের ইতিহাস খুব ভালো জানেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে এঁরই যোগ্য শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার কথা। আউটরাম ঘাটে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দাও, সাহেব। হ্যাঁরে ছুলাল, ঢাকের গল্পটা একটু শোনা না ? লয়টা যেন বিলম্বিত হয়—তা হ'লে আবার কফি-বিস্কুট আসবে।"

ছুলাল বলতে লাগল, "ক্যাপটেন ড্রেক জলদস্যু ছিলেন বটে, কিন্তু দেশকে তিনি খুব ভালবাসতেন। মাঝে-মাঝেই বাড়ি ফিরে আসতেন। তাঁর ঘরে একটা ঠিক এই ধরনের ঢাক ছিল। তিনি

বলতেন যে, ইংল্যাণ্ডের যদি বিপদ হয় তা হ'লে আগুতেই খবর পাবেন। বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলেই প্রেতাত্মারা এসে ঝাঁকি ঢাক বাজাত—স্প্যানিস আর্মাডা যখন বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে তখনও তিনি বাড়ি ছিলেন। মহারানী এলিজাবেথ তাঁকে ডেকে পাঠাবার আগেই ক্যাপটেন ড্রেক শুনতে পেলেন, অশরীরী এক প্রেতাত্মা এসে ঢাক বাজাচ্ছে তাঁর···এই সেরেছে! গণ্ডারের বাচ্চা নিশ্চয়ই ক্যাপটেন সাহেবের ঘরে ঢুকেছে। গন্ধ পাচ্ছ না, গজুদা?"

তিনজনেই চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগলেন। তারপর তিনজনেই একসঙ্গে লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। শেল্‌ফের কাছে মেঝেতে ব'সে রয়েছে গণ্ডারের বাচ্চা। তলার তাক থেকে একটা বই টেনে নিয়েছে সে। মরক্কো চামড়া দিয়ে বাঁধাই ছিল বইখানা। গণ্ডারের মুখ থেকে বইটা টেনে নিয়ে ক্যাপটেন সাহেব বললেন, "প্রথম চ্যাপ্টারটা পুরো খেয়েছে। মলাটেরও কিছু নেই···"

ছেঁড়া বইটা নিজের হাতে নিয়ে দুলাল বলল, "ছি ছি, এ যে খুব দামী বই দেখছি! নৌ-বিজ্ঞানের লেটেস্ট আবিষ্কার সব।"

গজাননবাবুর মুখের রেখাতেও শোকের চিহ্ন। বিরক্তির সুরেই তিনি ধমকে উঠলেন, "তোর মতোই ব্যাটা বিজ্ঞানপাগ্‌লা দেখছি। বোধ হয় পণ্ডিত হ'তে চায়।"

"না গজুদা, এমন কথা বোলোনি—ওর মানবতার গপ্প শুনলে থ মেরে যাবে। গুণ কি ওর কম? চেয়ে ভাখো ওর সহনশীল চামড়ার দিকে। নাল-লাগানো জুতো ছুঁড়ে মেরেছি বার কয়েক, তবুও আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে ভক্তিবাদের দৃষ্টান্ত যা দেখালে আমি নিজেও থ মেরে গেলুম! বায়স্কোপের ছবির মতো দাগগুলো মিলিয়ে গেল তক্ষুনি। এমন একটি অদ্বিতীয় গণ্ডার তুমি ইতিহাস থেকে খুঁজে আনো তো?"

ইতিহাসের কথা উঠে পড়তেই গজানন মুখুজ্জে মুশকিলে প'ড়ে গেলেন। সারা জীবন জেল খাটলেন, ইতিহাস পড়বার সময় পাননি। গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগের সর্বনিম্ন স্তরে গীতাখানা লাল কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাও তো পড়বার সময় পাননি! অগ্নিযুগের অস্ত্র ছিল ওটা। গীতা ছুঁয়ে শপথ গ্রহণের পর দলে ঢোকবার অধিকার পেয়েছিলেন গজাননবাবু। অতএব ইতিহাসের পথে পা না বাড়িয়ে তিনি বললেন, "ওপরের তাকে এতো সব রং-বেরঙের মেয়েছেলের ছবি-আঁকা ম্যাগাজিন রয়েছে, সেগুলোতে ঠোঁট লাগালো না ব্যাটা!"

"সেই জন্যই তো ওর নাম রেখেছি মদনভস্ম। ডাকনাম শুধু মদ্‌না। পরীক্ষা ক'রে ছাখো তুমি। মদ্‌না ব'লে ডাকলেই কুৎকুৎ ক'রে তোমাব দিকে চেয়ে থাকবে।" তুলাল দত্ত এবাব নিজেই গণ্ডারের গায়ে পা দিয়ে খোঁচা মেবে বলল, "চল্‌, বাইরে বেরো। মদ্‌না—"

ক্যাপটেন ড্রেক দেখলেন গণ্ডারের পেছনে পেছনে ওঁরা তুজনও কেবিন থেকে বেবিয়ে গেলেন। নৌ-বিজ্ঞানের বইখানা আপাতত শেল্‌ফের ওপবেই ফেলে রাখলেন তিনি।

বাইরে বেরিয়ে এসে তুলাল বলল, "একজন বিদেশীব সামনে মদ্‌নাকে গালাগাল দেওয়া উচিত হয়নি তোমার। যাই বলো না গজুদা, কে ভালো কে মন্দ আমরা তার জানি কি? বাইরে থেকে কাউকে বিচার করতে যেয়োনি। আমাদের লীডার বাগনানের সেই বিজয় মান্নাকে দেখতুম, বকে ব'সে তুনিয়ার লোকের ঠিকুজি বিচার করছে। গজুদা, ক'টা দিন ভালো ক'রে মেশো মদ্‌নার সঙ্গে, তখন তুমিও সুখ্যাতি করবে ওর। ইতিহাসের কাণ্ডই আলাদা! কখন কাকে এনে পৃথিবীর বুকে হাজির করবে বলা মুশকিল। গতকাল যাকে গণ্ডার ব'লে গাল দিয়েছ, আগামীকাল তাকেই তুমি সোনার-চাঁদ ব'লে আদর করছ। রাজনীতি তো করলে এতোকাল, ভেতরের রহস্য বুঝতে পারোনি?"

"তুই বল্, আমি শুনি।"

মদনেব গায়ে পা বুলতে বুলতে তুলাল দত্ত বলল, "ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ ওসব কথাগুলোর কোনো অর্থ নেই। দাগগুলো মুছে ফেলবার শুধু কৌশল জানা থাকলেই হ'ল। অনেক ঘা খেয়ে খেয়ে বাগনানের বিজয় মান্নাও রাজনীতি শিখেছিল। এখন সে বালিগঞ্জে থাকে, তু'খানা বাড়ি—রকে বসে না আর।"

"তুই কি ক'রে জানলি?"

"ক'দিন আগে আমাদের সেই বিশু মুখুজ্জের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলুম। সে লিখেছে: 'শীতকালেও বালিগঞ্জে আজকাল আর কুয়াশা পড়ে না। দূব থেকেই সব-কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। শুনলে আশ্চর্য হবি তুলু, বিজয় মান্নারও তু'খানা বাড়ি! রাস্তায় ঘাটে আমাদেব দেখতে পেলে গাড়ি থামায়। ডেকে বলে, 'নতুন স্টাইলে দল গড়ছি রে বিশু।' গজুদা, আউটরাম ঘাটে তাড়াতাড়ি পৌঁছেও বোধ হয় লাভ নেই।"

সবিস্ময়ে তুলালেব দিকে চেয়ে রইলেন গজাননবাবু। গত ক'দিন থেকে মাঝে মাঝেই সে লাভ-লোকসানের কথা নিয়ে আলোচনা করছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতি তুলালের যেন বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই। ওর ধাবণা, উনিশ-শো সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাসে ভেজালের পরিমাণ খুবই বেশি। অর্জনের গৌরব থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে। দিল্লীর দফ্তরে স্বাধীনতার যে-দলিলটি তৈরি হ'ল ভারতবর্ষেব কোটি কোটি লোক তাতে স্বাক্ষর কবেনি। দেশের মাটিতে পা ফেলতে তুলালের তাই ভয় করছে।

গজাননবাবু বললেন, "ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছিস—তাড়াতাড়ি পৌঁছনোই ভালো।"

মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল তুলাল। এবার সে হাসতে হাসতে বলল, "হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। বিজয় মান্নার মতো আমরাও গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে বসব।"

"কি ব্যবসা করবি ?"

"ব্যবসার প্ল্যান আসবে স্বপ্নে। গজুদা, আমরা দুজনে যেদিন একই রকমের স্বপ্ন দেখব, ঠিক সেইভাবেই ভবিষ্যতের পথ তৈরি করব আমরা। প্রত্যেকদিনের স্বপ্ন নোট-বইতে লিখে রেখো কিন্তু। ঘুম থেকে উঠে আমরা মিলিয়ে দেখব। সুপতিদার ওপর নির্ভর কোরো না।"

বেলা ন'টা নাগাদ বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ল। যাত্রীর ভিড় বেশি নেই। মুখুজ্জেমশাই ক্লান্ত। নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন তিনি। যাওয়ার আগে দুলাল দত্ত তাঁর কাছ থেকে টুপীটা চেয়ে নিল। নিজের মাথায় লাগিয়ে সে চ'লে গেল ডেকের দিকে। যাত্রীদের মধ্যে বাঙালী একজন ছিলেন। গভর্নমেণ্টের ফরেস্ট-ডিপার্টমেণ্টে বড় চাকরি করেন তিনি। অন্য কোনো সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে যদি দেখা হ'য়ে যায় সেই ভয়ে তিনি নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। আত্মসম্মান বাঁচাবার আর কোনো পথ ছিল না জাহাজে। কয়েকজন গুজরাটীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল দুলালের। এরা কাঠ চেরাই করে। তিন বছর পর দেশে ফিরছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের খবর কেউ রাখে না। যাত্রীদের মধ্যে সিন্ধী দোকানদার আর শিখ ঠিকেদারও ছিল গুটিকয়েক। প্রত্যেকের সঙ্গেই পরিচয় হ'ল ওর। প্রত্যেকেই গণ্ডারের বাচ্চাটাকে আদর করতে লাগল, গায়ে হাত বুলতে লাগল নানান রকম কায়দায়। কেউ আঙুল ঠেকাচ্ছে, কেউ বা হাতের উল্টো পিঠটা ঘ'ষে দিচ্ছে মদনের গায়ে। কুকুর কিংবা বেড়াল হ'লে হাত ঠেকাতে ঘেন্না করত না এরা। জাহাজে খবর র'টে গিয়েছিল, দুজন নামজাদা দেশপ্রেমিক কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন। ঠিকেদার কৃপাল সিং বলল, "পোর্ট-ব্লেয়ারে অনেক কিছু করবার আছে, সার। দু'এক মাসের মধ্যে রিফিউজীরাও এসে পৌছবে। আমি ক্লাস-ওয়ান কন্ট্রাক্টর —মেরা নাম কৃপাল সিং। মন্ত্রীটন্ত্রীদের সঙ্গে চেনা-পরিচয় থাকলে,

ঠিকেদার লোগদের ভি দেশপ্রেম থোড়া বহুৎ আ সাক্তা।" সিন্ধী দোকানদাররাও আন্দামানের উন্নতিকল্পে নানা রকমের প্রস্তাব পেশ করতে লাগল দুলালের কাছে। খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল সে। হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো প্রস্তাব এগুলো নয়। গুজরাটী কাঠ-চেরাইওয়ালারা আন্দামানের অরণ্যসম্পদ সম্বন্ধে যত খবর রাখে তার অর্ধেক খবরও গভর্নমেণ্টের জানা নেই। বাঙালী ফরেস্ট-অফিসারটি আত্মসম্মান খুইয়ে এদের সঙ্গে ব'সে যদি গল্পগুজবও করতেন তা হ'লে বোধ হয় আন্দামানের উপকারই হ'ত। বিন্দুমাত্র অসহায়তা প্রকাশ করল না দুলাল। মনপ্রাণ দিয়ে শুনতে লাগল সব কথা। মাঝে মাঝে মাথায় হাত লাগিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখছে, টুপীটা ঠিক বসানো আছে কিনা। মদ্‌নার তো পোয়া বারো! গুজরাটীরা ইতিমধ্যে ভুট্টা খেতে দিয়েছে ওকে। একসঙ্গে গোটা ছয় ভুট্টা এনে ওরা মুখের সামনে ফেলে রাখল। সিন্ধী মার্চেণ্ট ভেল্সিমল হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "আগে খবর পেলে পোর্ট থেকে কিছু খাবার আমি ওর জন্য আনতে পারতুম। এখন শুধু একটা আনারস ছাড়া আর কিছু দিতে পারলুম না। প্লিজ্‌ রিমেম্‌বার মাই নেম—" পকেট থেকে একটা নাম-লেখা কার্ড বার ক'রে দুলালের হাতে দিল সে।

মানুষ সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে দুলালের। ভালো লাগছে। স্বাধীন মানুষদের নমুনাগুলো মন্দ নয়। ঘণ্টাখানেক পর দুলালেরও ক্লান্তি এল। ক্লান্তি শুধু বন্দীজীবনের ব্যাধি নয়, খোলা জায়গারও উৎপাত। পাকা আমের গন্ধ পেলে চতুর্দিক থেকে মাছির দল যেমন উড়ে আসে, এক-এক ক'রে প্রত্যেকটি যাত্রী তেমনি দুলালকে এসে ঘিরে ধরল। এখন আর কেউ প্রস্তাব পেশ করছে না, পরিকল্পনা। মন্ত্রীরা যদি সাহায্য করেন তা হ'লে পাঁচ বছরের মধ্যে আন্দামান-দ্বীপটি সিঙ্গাপুরকেও নাকি ব্যবসা-বাণিজ্যে ছাড়িয়ে যেতে পারবে!

আনারসের রস তো খেয়েছেই মদন, একরত্তি ছিবড়ে কিংবা খোসার পর্যন্ত অস্তিত্ব নেই। গণ্ডারের খাওয়ার ধরনটি বড় ভালো। দুলালের ভারি পছন্দ। দাঁতে, জিবে কিংবা মুখে খাদ্যের চিহ্ন কিংবা গন্ধ পর্যন্ত থাকে না! বাজারের যা অবস্থা, তাতে ওর মনে হয়, মদ্‌নার মতো গুটি ত্রিশ গণ্ডারকে খাওয়ার স্বাধীনতা দিলে, পৃথিবীর সমুদয় ধনভাণ্ডারটিকেও খেয়ে শেষ ক'রে দেবে। অথচ মুহূর্তের জন্যও লজ্জাবোধ করবে না।

কেবিনে ফিরে এসে দুলাল বলল, "বুঝলে গজুদা, মদ্‌না খুব পপুলার হয়েছে। সিন্ধী, গুজরাটী, শিখ এবং মারোয়াড়ীরা যা-কিছু এনে দিলে—ভুট্টা, আনারস, চানা সবই এক ঘণ্টার মধ্যে সাফ হ'য়ে গেল। একটি ঢেকুর পর্যন্ত নেই!"

"সেইজন্যই তো পৃথিবীর মনি-মার্কেট এতো টাইট।—একটু ঘুমুতে দে, দুলাল।" গজানন মুখুজ্জে উল্টো দিকে পাশ ফিরলেন।

ঘুম কারো এল না, গা গুলতে লাগল। বিকেলের দিকে জাহাজটা দুলতে লাগল খুব। পোর্টহোল্ দিয়ে দুলাল চেয়ে দেখল, ঝড় উঠেছে। বাইরে বেরিয়ে এল দুজনেই। চতুর্দিকের দৃশ্য ভয়াবহ। আকাশ আর সমুদ্র প্রায় এক হ'য়ে গিয়েছে। সকাল-বেলা দিগন্ত ব'লে কিছু ছিল না। এখন মনে হচ্ছে, সমুদ্রের উপর মেঘের ছাউনি। সমুদ্রের জল থেকে ছাউনির প্রান্ত মাত্র হাত-দশেক ওপরে। বিদ্যুতের আলোয় ওটাকেই দিগন্ত ব'লে বার বার ভুল হ'তে লাগল। জাহাজখানা যেন একটা নেংটি-ইঁদুর—তিড়িং-বিড়িং ক'রে লাফাচ্ছে। অন্ধকার গহ্বরে কখন গিয়ে যে ঢুকে পড়বে তার জন্যই যেন যাত্রীরা সবাই অপেক্ষা ক'রে আছে।

অভিযোগের সুরে গজানন মুখুজ্জে বললেন, "মুক্তি চাই, মুক্তি চাই ব'লে তো দিনরাত্তির চেঁচিয়ে মরছিলি···ফাইলের গোলমালে আমাদের নামগুলো যদি মন্ত্রীরা আরও কিছুদিন ভুলে থাকতেন তা হ'লে ক্ষেতি কি ছিল রে, ছোঁড়া? নে এবার ঠেলা সামলা—একটা

কাগজের নৌকোর বন্দীশালায় ব'সে থাক্, অপেক্ষা কর্ কখন এটা ডুববে। ডাঙা তো তোর পছন্দ হচ্ছিল না। দুলাল—"

"দাদা—"

"কাছে এগিয়ে আয়। প্রতিজ্ঞা কর্, মৃত্যুর পরেও যেন আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকে।"

"থাকবে, দাদা। তুমি আমার শুধু বন্ধু নও, লীডারও। আমরা কি তলিয়ে যাচ্ছি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। গলা অবধি ডুবেছে। কুছ পরোয়া নেই—আমরা অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষা নিয়েছিলুম—"

"এবার যে জলমন্ত্রের প্যাঁচে পড়লুম গো দাদা!"

কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছল দুজনে। গজানন মুখুজ্জের গা ঘেঁষে দাঁড়াল সে। সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠল।

"আয়, দুজন দুজনকে আলিঙ্গন করি।" গজাননবাবু তাঁর বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে দুলালের শীর্ণ দেহটাকে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দুলাল তার আগেই নিজের উদ্যমে লাফ মেরে মুখুজ্জেমশায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। মাঝে মাঝে পা দুটো আলগা ক'রে তাঁর ঘাড়ের ওপর ঝুলে থাকবার চেষ্টাও করছে সে। ছ'ফুট লম্বা গজানন মুখুজ্জে টেরও পাচ্ছেন না, তাঁর চওড়া বুকের ঠিক কোন্খানটায় দুলালের দেহটা লেপ্টে রয়েছে। মনে পড়ল পারুলবালার কথা। পারুর সঙ্গে তখন তাঁর গভীর প্রেম। সে একদিন বলল, "গজুদা, ফতুল্লার কোথাও তো এক ইঞ্চি নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাচ্ছি না। পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতোকাল প্রেম করবে?" "কোথায় যেতে চাও?" পারু বললে, "চলো না, মধুমতীর জলে পা ডুবিয়ে বসি। যাবে? যেতে তিন মাইল, আসতে তিন মাইল।" পারুল-বালাকে তিনি হাতের ওপর চ্যাংদোলা ক'রে শুইয়ে নিয়েছিলেন। পারুই বলেছিল, "সারাটা পথ তোমার মুখ দেখতে দেখতে যাব, গজুদা। হাঁপিয়ে পড়বে না তো?" গজাননবাবুর মনে পড়ে,

হাতের ওপর শুয়ে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে পড়েছিল পারুলবালা নিজেই। সেই তুলনায় ত্বলাল তো কিছুই না। ষোলো বছর বয়সে পারুর যা ওজন ছিল, আটাশ বছর বয়সে ত্বলাল তার অর্ধেকের চেয়ে একটু বেশি। বঙ্গোপসাগরের পুরো পথটাই ওকে ঘাড়ের ওপর লগির মতো লট্‌কে নিয়ে পার হ'য়ে যেতে পারেন তিনি।

ঠিক এই সময়ে বিরাট একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা এসে জাহাজের গায়ে লাগল। জাহাজটা একদিকে কাৎ হ'য়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্বজনেই প'ড়ে গেল রেলিং-এর ধারে। ত্বলাল ডুকরে কেঁদে উঠল, "দাদা গো, আমাদের যে ফাইলের মধ্যেই ম'রে থাকা ভালো ছিল! মা—মা ত্বর্গা, সর্বজনীন, আমি তো বাগবাজারের ভাগ্নে, মা! হে পরমা প্রকৃতি···গজুদা, তোমার মন্ত্রীরা ফাইলটা খুঁজে পেলেন কি ক'রে?"

"ইংরেজ ব্যাটারা ফেলে গিয়েছে যে। সাবধান ত্বলু, সামনে বিত্ত্যৎ, মাথার ওপরে বজ্র, পেছনে ধাক্কা। এবার বোধ হয় আরও জোরে মারবে রে! ত্বলু, সর্বজনীন ত্বর্গা তোর বাগবাজারের বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আমাদের মা-কালীই শেষ সম্বল। মা, মা গো—" হাত জোড় ক'রে গজাননবাবু উচ্চকণ্ঠে আত্মাশক্তির উপাসনা করতে লাগলেন, "মা, কোথায় তুমি মা? দীর্ঘদন্তী, রক্ত-চক্ষু, ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত দেহ, বিস্তৃত মুখ—মানুষ কতো অসহায়, মা!" পেছন থেকে লাফ দিয়ে গুঁতো মারল মদন। এক বছরের বাচ্চা তাই বেঁচে গেলেন মুখুজ্জেমশায়। নাকের ওপর কচি ঘাসের মতো লোমগুলো এখনো শক্ত হয়নি। কালক্রমে ঐ লোমগুলোই শক্ত হ'তে হ'তে মারণ-অস্ত্রে রূপান্তরিত হবে। পেছন ফিরে গজাননবাবু চেয়ে দেখলেন, ক্যাপটেন ড্রেক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মৃত্ব হেসে তিনি বললেন, "উঠে পড়ুন, মিস্টার মুখার্জী। আর ভয় নেই। ছোট্ট ঝড়, আন্দামানের উপকূল পর্যন্তও পৌঁছতে পারবে না। ইউ লাইক ড্রিঙ্কস্?"

গজানন মুখুজ্জে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দুলাল দত্তর দিকে। সে ফিসফিস ক'রে বললে, "সাহেব আমাদের মদ খেতে ডাকছেন। বোধ হয় খাঁটি স্কচ খাওয়াবে ব্যাটা—"

"তাই ব'লে আমায় ফেলে যাচ্ছিস কেন? তোর যে আর তর সইছে না, ছোঁড়া। দাঁড়া, আমিও আসছি। দুলাল—দুলু—ভাইটি আমার···তোরা এগো, আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসছি।"

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হ'য়ে গেল সবার। যতোদূর পেরেছে স্কচ, ব্র্যাণ্ডি, বীয়ার সব-কিছুই পান করেছে দুলাল। এক-এক ঢোক খায় আর ঘোষণা করে, "রুল্ ব্রিটানিয়া! আহা, এমন দিনে শুধু কমলদার কথা মনে পড়ে! এমন আমুদে মানুষ আমার তো আর চোখে পড়েনি। কলকাতা ফিরে গিয়ে আগে তাঁর সঙ্গেই দেখা করব। ঠাকুরমার ঝুলি তো পুরনো, আহা, কমলদার ঝুলি থেকে যা-সব গল্প বেরুত, মাইরি বলছি গজুদা, তার কোনো তুলনা নেই। এতোদিনে তিনি বোধ হয় গল্পের সম্রাট হ'য়ে বসেছেন। তুমি শুধু আধ-পেগ ব্র্যাণ্ডি নিয়ে ব'সে রইলে কেন, গজুদা? খেয়ে নাও, এমন সুযোগ আর পাবে না। অগ্নিমন্ত্রের তেজ কি আমাদের নেই ভাবছ? হায়, হায়, হায়! এটা কি বার করলে সাহেব? উনসত্তর নম্বরের ভ্যাট্!! বন্দে মাতরম্! ভ্যাট্ পান করছি, কমলদা। অপরাধ নিয়ো না—তুমি হয়তো কফি-হাউস থেকে বেরিয়ে দু'খিলি পান কিনছ! ভুলিনি, প্রতিশোধ আমরা নেব। তোমার সঙ্গে কালী-মার্কা খেয়েছি—শুধু কালী-মার্কা। এই সামাজিক বৈষম্য যদি ঘুচিয়ে না দিতে পারি, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আর আমি দেখা করব না, কমলদা।" ডুকরে কেঁদে উঠল দুলাল। বোধ হয় পুরোপুরি মাতাল হ'য়ে গিয়েছে। খুবই অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলেন গজাননবাবু। ক্যাপটেন ড্রেক ফিসফিস ক'রে তাঁকে বললেন, "আহা, ভেতরটা একেবারে শুকিয়ে খরখরে হ'য়ে গিয়েছিল।"

গজানন মুখুজ্জে ঠিক সেই লাইনে চিন্তা করছিলেন না। দুলালের একটা নতুন চেহারা দেখছেন তিনি। বঙ্গোপসাগরের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও, দুলাল বোধহয় দূরের ক্রন্দন শুনতে পেয়েছে। এ-ক্রন্দন ব্যর্থতার। আসলে কমলদা ব'লে কেউ নেই। কমলদা অলীক, বিমূর্ত কল্পনার প্রতীক হওয়াও সম্ভব। নিজের ব্যর্থতা ওর ঐ শুকনো বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে থাকলে এতোদিন বেঁচে থাকতে পারত না। তাই কমলদাকে আবিষ্কার করেছে দুলাল। মনে মনে বহুদিন আগেই ও বঙ্গোপসাগরটা পার হ'য়ে গিয়েছিল। উপেক্ষিত প্রতিভা সমাজের খুঁটি তলা থেকে আলগা ক'রে দেয়। অযোগ্যের প্রভাব যে আজ সর্বব্যাপী, দুলাল বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছে। তাই মাতাল হওয়া সত্ত্বেও কেবিনে ফিরে যাওয়ার পথে সে বলল, "বারোদুয়ারীতে কমলদা আজো মাটির খুরি হাতে নিয়ে মাথা কুটে মরছে। তাঁকে বোধ হয় আর বাঁচানো যাবে না!"

দেরি হ'লেও, পরের দিন গজানন মুখুজ্জে শয্যা ত্যাগ করলেন দুলালের আগে। বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। গতকালের ঝড় সমুদ্রের বুকে বিন্দুমাত্র চিহ্ন রেখে যায়নি। পাটির মতো সমতল। সূর্যের আলো ঝলমল করছে। বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন তিনি। দুলাল যাই বলুক-না কেন, পথ সামনের দিকে, পেছনে নয়। ফাইলের অরণ্যে ডুবে থাকলে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব হ'ত। সুপতিদাকে ধন্যবাদ।

গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ থেকে নিমের দাঁতন বার করতে গিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন গজাননবাবু। এ কি করেছে দুলাল? দাঁতন নেই, ব্যাগের মধ্যে শুধু নটে-শাক!

॥ তিন ॥

একদিন বিকেলবেলার দিকে আউটরাম ঘাটে এসে পৌঁছল জাহাজ। যাত্রীরা সবাই এক-এক ক'রে নেমে যাচ্ছে। নামবার জন্য ছটফট করছিল দুলাল। কলকাতার মাটি দেখতে পেয়েছে, ওর তর সইছে না আর। প্রায় সাত বছর আগে এই ঘাট থেকেই বিদায় নিয়েছিল। তখন কলকাতা ছিল পেছনে, এখন সামনে। ঐ তো ইডেন-উদ্যানের উঁচু গাছ দু'একটা দেখা যাচ্ছে! রেলিং-এর দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল সে।

"আর কতোক্ষণ জাহাজে দাঁড়িয়ে থাকবে, গজুদা? সবাই যে নেমে গেল!"

"নাঃ! পাকড়াশীদা বোধ হয় আসতে পারেননি!" দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললেন গজানন মুখুজ্জে, "বুঝলি দুলু, ওঁদের তো এখন দম ফেলবার সময় নেই। ছোটখাটো একটা শোভাযাত্রার মতো লোক নিশ্চয়ই ওঁরা পাঠিয়েছেন। গত দু'দিন তোর সঙ্গে বেশি কথা কইনি কেন জানিস? মনে মনে একটা ছোট্ট ভাষণ তৈরি ক'রে রেখেছি। কাগজওয়ালাদের নিজস্ব সংবাদদাতারা কেউ এসেছে কিনা ছাখ্ তো।"

"এখান থেকে কি ক'রে দেখব? চলো ডাঙায় নেমে গিয়ে দেখি।"

দুলাল এবার মদনকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কুলীরা কেউ সামনে এল না। সঙ্গে কিছু মালপত্তর আছে কিনা তার খোঁজ পর্যন্ত করল না ওরা। যাত্রী দুটির চেহারা দেখেই কুলীরা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল, এরা গুজরাটী, সিন্ধী কিংবা শিখ নয়, এরা বাঙালী। মাথায় গান্ধীটুপী পরলে কি হবে, এরা খুনী। গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা এবার গজাননবাবু নিজের হাতেই ঝুলিয়ে নিলেন। দুলালের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেন। সামনে পড়লেন এক ভদ্রলোক। দেখতে রোগাই বলা চলে। গায়ের

রং তামাটে। কলকাতার রোদ লেগে লেগে ঝলসে গিয়েছে। চোয়াল ভাঙা। ব্যাক-ব্রাশ করা বটে, কিন্তু মাথার মাঝখানে চুল নেই। হাঁটুর তলা পর্যন্ত পাঞ্জাবির ঝুল। খুব মিহি সুতোর পাঞ্জাবি ব'লে 'সামারকুল' গেঞ্জির ফাঁক ফাঁক বুননি ভেসে উঠেছে ওপর দিকে। বাইরে থেকে সবাই দেখতে পাচ্ছে, ভদ্রলোকটি আদ্দির পাঞ্জাবি আর সামারকুল গেঞ্জি পরেন। বোধ হয় এইমাত্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা জাহাজঘাটে এসেছেন ডিউটি দিতে। ঘাড়ে এবং গলার নিচে পাউডার লেগে রয়েছে। বাঁ হাতের মুঠোয় তাঁর ধুতির প্রান্ত, ডান হাতে মস্ত বড় একটা ফোলিও-ব্যাগ। পাঞ্জাবির বুকপকেট আছে। পকেটের মাপে চামড়ার পার্স কিনেছেন তিনি। কিংবা পার্সের মাপে পকেট তৈরি করিয়েছেন। বাইরে থেকে পার্সটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোকটি শুধু খাঁটি বাঙালী নন, সর্বভারতীয় ঐতিহ্যও তিনি বুকের ওপর বহন করছেন। পার্সের গায়ে অজন্তার ছবি আঁকা। জাহাজ ঘাটে লাগবার আগে থেকেই পান চিবচ্ছিলেন ভদ্রলোকটি।

তুলালকে ধাক্কা দিয়ে একধারে সরিয়ে দিয়ে গজানন মুখুজ্জে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ কাগজের প্রতিনিধি আপনি? লিখে নিন বিবৃতিটা—" গজাননবাবু গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা মাটিতে রেখে দিয়ে গম্ভীরভাবে মিনিটখানেক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন আর এক সেকেণ্ড দেরি করলেই ট্রেন ফেল্ করত তুলাল! চকিতের মধ্যে ঘুরে দাঁড়াল সে, তারপর এক লাফ মেরে গজাননবাবুর বুকের কাছে এসে বললে, "তোমার বুঝি ফোটো তোলা হচ্ছে, গজুদা? খবরের কাগজে আমার ছবিও ছাপা হবে না কেন? কই, মদ্না গেল কই—আয়, চু চু চু, আমাদের তিনজনকেই একসঙ্গে নিন, মশাই।"

ভদ্রলোকটি একধারে স'রে গেলেন। শুধু স'রে গেলেন না, এদের দিকে পেছন দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। গজাননবাবু তৎক্ষণাৎ তুলাল আর মদনের গ্রূপ থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকটিকে

বলতে লাগলেন, "আমি—আমিই সেই অগ্নিযুগের গজানন মুখুজ্জে। দেশের জন্য সব-মিলিয়ে বিশ বছর জেল খেটেছি। মশাই, স্ত্রীর সঙ্গে শুধু বিয়ের রাত্রিটা—মানে, বাসী-বিয়ের পর্যন্ত সুযোগ দেয়নি সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ! মেয়ের বয়েস আজ প্রায় পনরো, এক সেকেণ্ডের জন্যও দেখা হয়নি। জীবন, যৌবন, ধন, মান সবই দেওয়া হ'য়ে গিয়েছে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে। এই ব্যাপারে আমার চেয়ে সিনিয়র শুধু মহারাজ, অর্থাৎ···লিখে নিন মশাই! এমন সুযোগ আর পাবেন না। এর পরে তো ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভেজাল ঢুকবে—"

বাধা দিয়ে দুলাল বললে, "এর পব ইতিহাস ব'লে কোনো সাবজেক্টই থাকবে না। মশাই, নেপোদের বাজত্ব কি শুরু হ'য়ে গিয়েছে?"

ভদ্রলোকটি এবার বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "আমি কোনো কাগজেব প্রতিনিধি নই। আমার বড়দাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"বড়দা? বড়দা কে এলেন আন্দামান থেকে?" জিজ্ঞাসা করল দুলাল।

"ফরেস্ট-অফিসার।"

সর্বভারতীয় জনতার সঙ্গে গোড়াতেই বেরিয়ে এলে ভালো হ'ত। কাঠ-চেরাইকারী গুজরাটী, দোকানদার সিন্ধী এবং ঠিকেদার শিখ গজাননবাবু এবং দুলালকে শ্রদ্ধাই দেখিয়েছিল। গণ্ডারের বাচ্চাকে ভালবাসতে পর্যন্ত দ্বিধা করেনি। এই বাজারে বিনে-পয়সায় ভুট্টা, চানা আর আনারস রিফিউজীদেরও কেউ দেয় না। তা ছাড়া ভিড়ের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারলে হঠাৎ-নিঃসঙ্গতার পীড়ন থেকে মুক্তি পেতেন এঁরা। এখন মনে হচ্ছে, সবাই এঁদের পেছনে ফেলে গেল। জনাকীর্ণ পৃথিবীর আউটরাম-ঘাটেই শুধু নির্জনতা। এঁরা পরিত্যক্ত এবং বর্জিত। শোভাযাত্রা তো দূরের কথা, যারা সঙ্গে এসেছিল তারাও আর নেই। ট্যাক্সি, রিক্শা এবং ঘোড়ার-গাড়িতে চেপে তারা সবাই চ'লে গিয়েছে। এমনকি

ফরেস্ট-অফিসারটিও ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে একটু আগেই উধাও হ'য়ে গেলেন। দুলালের ঘাড়ে হাত রাখলেন গজানন মুখুজ্জে। অবলম্বনের দরকার হ'ল। গত বিশটা বছর শুধু কতকগুলি সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন এবং মাসের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়! কেউ আসেনি; অতীত কীর্তির স্বীকৃতি আউটরাম ঘাটের কোথাও নেই। কলকাতার রাস্তায় পা দিয়েই গজাননবাবু ভাবলেন, আজ যদি শুধু পারুলবালা বেঁচে থাকত!

বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। ইডেন-উদ্যানের দিকটাতে তাই সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। রাস্তাটা পার হ'তে হবে। উত্তর দক্ষিণ দু'দিক থেকেই গাড়ি আসছে—গাড়ির সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে ব'লে মনে হ'ল গজাননবাবুর। দুলালের ঘাড়ে হাত রেখে অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রথম রাস্তাটা পেরিয়ে এলেন তিনি। সামনেই মস্ত বড় একটা মূর্তি, এটা তিনি প্রথম দেখছেন। রাজার মূর্তি তাতে আর সন্দেহ নেই। গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। দুলালকে বললেন, "তড়বড় করিস্‌নি, একটু দাঁড়া। প্রণাম ক'রে নি'।" মাটিতে বসলেন গজাননবাবু, তারপর একেবারে লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লেন। দুলাল ঠিক বুঝতে পারল না—তিনি প্রণাম করলেন, না স্ট্যাচুর সামনে মাথা কুটলেন। দুলাল বলল, "উঠে পড়ো, গজুদা। মারোয়াড়ীর বউরা গাড়ি থামিয়ে তোমায় দেখছে।"

ইডেন-উদ্যানের দক্ষিণদিকে লোক আর মোটরগাড়ির ভিড়। লালপাগড়ির সংখ্যাও কম নয়। কতিপয় ঘোড়সওয়ারও এদিক-ওদিক পাহারা দিচ্ছে। গজাননবাবু বললেন, "ছি ছি, ইডেন-উদ্যানের কী হাল্‌ হয়েছে দ্যাখ্‌! গাছপালা সব কোথায় গেল? চিনেবাদামের খোসা দেখছিস? এতো বাদাম পেল কোথায় বাঙালীরা?"

"বড়বাজারে।"

এই সময় লালপাগড়িরা বলতে লাগল, "হঠ্ যাইয়ে, হঠ্ যাইয়ে—" ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য গজাননবাবু বললেন, "ব্যাগটা একটু ধর্। দেখে আসি ইডেন-উদ্যানে কিসের তামাশা হচ্ছে। দুলু, ঠিক এইখানেই থাকিস কিন্তু।"

তিনি ফটকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ভিড়ের চাপ ক্রমশই বাড়ছিল। মদনকে নিয়ে মুশকিলে পড়ল দুলাল। কলকাতার ভিড়ের মধ্যে একবার মিশে গেলে গণ্ডারের বাচ্চা হয়তো বেহাত হ'য়ে যেতে পারে। দড়ির বক্‌লসের আর আয়ু কতটুকু! একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলেই নারকোলের দড়িটা ফুচ ক'রে পুড়ে যাবে। মদনকে স্বাধীনভাবে ইডেন-উদ্যানের এতো কাছে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। পশ্চিম-দিকে স'রে এল দুলাল। এদিকে আবার সাহেবদের জমাদার, আয়া আর বিলেতী কুকুরের ভিড়। একটা লোমওয়ালা কুকুর মদনকে দেখে দু'একবার ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। বিরাট একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান জমাদারের হাত থেকে ছুটে এসে মদনকে আক্রমণ ক'রে বসল। দুলাল চেঁচিয়ে উঠতেই জনতা আর জমাদারেরা ছুটে এল একসঙ্গে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। দুলাল নিরুপায় হ'য়ে ডাকতে লাগল, "পুলিশ, পুলিশ—" এদিকটাতে ডিউটি দেওয়ার জন্য সেদিন একটি পুলিশও আর ছিল না। সবাই ইডেন-উদ্যানের মধ্যে আর ফটকের আশেপাশে মোতায়েন। অ্যাল্‌সেশিয়ানের গলায় বিলেতী চামড়ার বক্‌লস। জমাদার এসে তার বক্‌লস ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল সাহেব-মেমদের সাঁতার-ক্লাবের দিকে। জনতা ঘিরে দাঁড়াল মদনকে। অতএব দুলালও মাঝখানে প'ড়ে গেল। জনতার সমবেদনা আর কৌতূহল ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। 'মশাই, পুলিশে রিপোর্ট করুন।' 'আমি বলি কি দাদা, উদ্যানের মধ্যে ওকে নিয়ে চলুন। ওখানে একজন মন্ত্রী গাছ পুঁতছেন—বনমহোৎসব। তাঁকে বলুন, ইংরেজের অত্যাচার এখনো

পুরোদমে চলেছে। চলুন, আমরা সাক্ষী দেবো।' একজন দর্শক এগিয়ে এসে মদনের বক্‌লস ধ'রে টান মারল। অন্য একজন পা দিয়ে ঠেলা মারতে লাগল। 'দেরি করবেন না, দেরি করবেন না—আমরা প্রত্যক্ষদর্শী।' অন্য একজন তুলালের হাত থেকে গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা টান মেরে ছিনিয়ে নিল। তার হাত থেকে আবার নিয়ে নিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। তৃতীয় ব্যক্তির হাতে গিয়ে যখন অন্তর্হিত হওয়ার উপক্রম, তুলাল তখন জনতার গায়ের ওপর দিয়ে লাফ মেরে ব্যাগটা গিয়ে চেপে ধরল। "মশাই, আমার ব্যাগ নিয়ে কোথায় চললেন? অ্যাল্‌সেশিয়ান তো আর ব্যাগটাকে কামড়ায়নি। বড় সাংঘাতিক দেশ তো! দিন, ব্যাগ ছাড়ুন।" বলবার আগেই ব্যাগটা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তি উধাও হ'য়ে গিয়েছে। ভিড় একটু হাল্‌কা হ'য়ে এসেছে। মন্ত্রীর কাছে মদনকে নিয়ে যাওয়ার জন্য যিনি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন তিনি এবার বললেন, "দাদা, একটি পয়সাও তো খরচা নেই, চলুন একবার দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

"কি দেখাবেন?" জিজ্ঞাসা করল তুলাল।

"কেন, ঐ যে বিলেতী কুকুরটা কামড়ে দিলে! তার দাগ তো একটা থাকবেই।"

"পাগল!" হেসে ফেলল তুলাল, "অ্যাটম-বোমা মারলেও মদনের গায়ে দাগ পড়বে না। আর ও তো কোথাকার কে, একটা অ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর।"

"বলেন কি। এ কোন্ গ্রহে জন্মেছে, দাদা? এ কোন্ জানোয়ার?"

"গণ্ডার।"

"ওঃ, গণ্ডার! আরে, রামো রামো—"

তিন-চারজন তখন একসঙ্গে ব'লে উঠল, "ছি, ছি, ছি—আগে বলেননি কেন মশাই? মূল্যবান সময় খানিকটা নষ্ট হ'য়ে গেল।

কোথায় গেলি রে শম্ভু, চল্ ওদিকটাতে গিয়ে দাঁড়াই—ঐ আসছেন, সামনের গেট দিয়ে বেরুচ্ছেন উনি—" বলতে বলতে এদের মধ্যে একজন দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল। প্রত্যক্ষদর্শীরাও সঙ্গে সঙ্গে পিছু ধরল তার। খুবই বিস্মিত বোধ করল দুলাল। স্রোতটা যেন মানুষের নয়, একসঙ্গে দম-দেওয়া কতকগুলি পুতুল মাত্র। মদনের গায়ে হাত বুলতে লাগল সে। "এ বড় সাংঘাতিক জায়গা," ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল, "দেখেশুনে পথ চলতে হবে রে। অবাধ স্বাধীনতা তোর পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।" ব্যাগটা খুলে ফেলল দুলাল।

গজাননবাবু ফিরে এলেন। যেখানে থাকবার কথা ছিল দুলাল সেখানে নেই। চারদিকে দৃষ্টি দিতে লাগলেন তিনি। ব্যাপার কি? জনতার পায়ের চাপে জখম হ'ল নাকি ছেলেটা? কিন্তু মদন, সে কোথায় গেল? তাকে জখম করা তো এই জনতার সাধ্যাতীত। পাকড়াশীদার গাছ-পোঁতা দেখতে এসেছিল এরা! পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগলেন তিনি। যে-গাছগুলো আছে সেগুলোকে রক্ষা করবার উপায় বার করতে পারছেন না সুপতিদা, অথচ ভিড় জমিয়ে নতুন গাছ পুঁতবার উৎসব করছেন কেন? অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন গজাননবাবু। শেষ ব্যূহটা ভেদ করতে পারলেন না। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই উৎসবটা শেষ হ'য়ে গেল। মাটিতে গর্ত করাই ছিল। চারাগাছটা ভেতরে গুঁজে দিতে আধ মিনিট লাগল, বাকী সাড়ে চার মিনিট বক্তৃতা দিলেন পাকড়াশীদা। তারপর মোটরগাড়িতে চেপে উদ্যান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুলালের কাণ্ড দেখে রাগ হ'ল তাঁর। এতো বাড়াবাড়ি আর ভালো লাগে না। একেই বিশ বছরের ব্যর্থতাটা আজ স্বচক্ষে দেখতে পেয়ে ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েছেন। তার ওপরে দুলাল আবার ব্যাগ থেকে তাঁর ল্যাঙট বার ক'রে মদনের বক্লসের সঙ্গে

বেঁধে রেখেছে। শেকলে-বাঁধা কুকুরের মতো মদনকে নিয়ে সে ফুটপাথের ওপর পায়চারি করছে। রাগের সুরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের জন্য সবই তো দিলাম, আর কি তোরা চাস? ব্যাগের মধ্যে আর রইল কি, দুলাল?"

"মানবজীবনের শূন্যতা ছাড়া আর তো কিছু হাতে ঠেকল না, গজুদা। এই নাও তোমার ব্যাগ।"

নিরিবিলিতে গিয়ে বসবার দবকার হ'ল। চারদিকে আলো জ্ব'লে উঠেছে। গঙ্গার দু'দিকেই আলো। দিনের বেলা ঠিক বোঝা যায়নি, রাত্রির রূপ দেখে মনে হচ্ছে, কলিকাতা নগরী সত্য-সত্যই হাস্যময়ী। দুঃখ কিংবা দারিদ্র্য যদি এর কিছু থেকে থাকে, তা হ'লে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির কৃপায় তা ঢাকা পড়েছে।

ফোর্টের দিকটাতে ভিড় একটু কম। ফোর্ট উইলিয়ামের নামটা কি বদলে গিয়েছে? বোধ হয় না। গজাননবাবুর মনে নানা রকমের প্রশ্ন উঠছে। ইডেন-উদ্যানের মহোৎসব দেখে তাঁর ধারণা জন্মেছে সুপতিদার হাতে নষ্ট করবাব মতো সময়ের অভাব নেই। হয়তো ফোর্ট উইলিয়ামের নামটা পাল্টে দেওয়ার জন্য সুপতিদা দিল্লীতে যাওয়া-আসা করছেন বার বার। হাজারীবাগ জেলে কিংবা বক্সা ক্যাম্পে ব'সে দেশের জন্য যতোটুকু কাজ করতে পেরেছিলেন এখন তিনি ততোটুকুও করতে পারছেন না। ইডেন-উদ্যানের ভেতরে এবং বাইরে শুধু চিনেবাদামের খোসা। দুলাল ঠিকই বলে, পাইকাররা সব বড়বাজারের। সুপতিদারা বড় বড় অফিস চালাচ্ছেন কেবল খুচরো কারবার চালাবার জন্য। আহা বেচারা দুলাল! একটা মহাদেশের কর্ণধার হওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও গণ্ডারের বাচ্চা নিয়ে চব্বিশঘণ্টাই মত্ত হ'য়ে আছে!

ফোর্ট উইলিয়ামের উত্তরদিকে মাঠের মধ্যে এসে একটু নিরিবিলি

জায়গা পেলেন ওঁরা। আউটরাম ঘাটটা এখান থেকে খুবই কাছে। গত আট বছরের অতীতটাকে ধ'রে রাখবার চেষ্টা ভেসে বেড়াচ্ছে এঁদের অবচেতন মনে। এটা সাইকোলজি। আন্দামানের অতীতটা কলকাতার বর্তমানের চেয়ে ভালো ছিল।

নটে-শাক তো ফুরিয়ে গেছে। ভুট্টা কিংবা আনারস হগ-সাহেবের বাজারে না গেলে পাওয়া যাবে না। মদন এখন খায় কি? দুলাল পেছন ফিরে দেখল, ফোর্টের উত্তর সীমানার কাছে বেশ ঘন জঙ্গল। গণ্ডারেব বাচ্চা এরই মধ্যে সেই দিকে চ'লে গিয়েছে খাদ্যের অন্বেষণে। দুলাল বলল, "ফোর্টের ভেতবে শুনেছি শাক-সব্জির বাগান আছে। ইংরেজের শাসন তো এখন নেই। মদন যাক-না একবার ভেতর থেকে ঘুরে আসুক?"

"আমার কাছে অনুমতি চাচ্ছিস কেন, ছোড়া? আমি কি তোদের কমাণ্ডার-ইন্-চীফ নাকি? ভাবিস্নে, খিদে পেয়েছে মদনের—সে কারো অনুমতিব তোয়াক্কা করে না। ছাখ্গে যা, এতোক্ষণে সে নিশ্চয়ই ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে।"

"বারুদ-ফারুদের গন্ধ পেয়ে মদন আবার ভয় না পায়। দুর্গে ঢোকবার সুযোগ তো আগে কখনো পায়নি ও। মদনের চোখে সব নতুন নতুন ঠেকবে।"

হিন্দুস্থানী চা-ওয়ালা এসে গিয়েছে। গজাননবাবু বললেন, "চা খাওয়া যাক। তোব সবচেয়ে বড় দোষ কি জানিস, দুলাল?"

"তোমার মুখ থেকে শুনলেই তো বিশ্বাস করব। তুমি হচ্ছ গিয়ে বামুন—"

"তোর দোষ হচ্ছে, নিজের কথা কখনো তুই ভাবিস না। মদন কি খাবে ভেবে মরছিস—আজ সারাটা দিন কি খেয়েছিস তুই?" চা-ওয়ালাকে গজাননবাবুই জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু খাবার এনে দিতে পারো ভাই?"

পেতলের কলসীর বুকে একটা নল বসানো। তৈরি চা।

নল দিয়ে চা পড়তে লাগল মাটির খুরিতে। তুটো খুরি তুজনের হাতে তুলে দিয়ে চা-ওয়ালা তার নিজের বাঁ হাতের চেটো চিৎ ক'রে দিয়ে বলল, "দিজিয়ে দো আনা।"

"খাবারের কি হবে ভাই? আমরা পরদেশী। রাস্তাঘাট চিনি না।" বলল তুলাল।

চৌরঙ্গীর দিকে হাত তুলে চা-ওয়ালা বলল, "উধার মে ফারপো হোটেল হায়। আচ্ছা-আচ্ছা খানা মিলেগা।—দিজিয়ে দো আনা।"

পয়সা নিয়ে চা-ওয়ালা চ'লে গেল সামনের দিকে।

চা-এ চুমুক দিয়ে তুলাল বলল, "তোমার সঙ্গে সুপতিদার দেখা হ'লে তাঁকে জিজ্ঞেস কোরো তো, চা-এর নাম ক'রে এরা তামাকের জল বেচছে কেন? ছি, ছি—ওয়াক! গজুদা, চলো আন্দামানেই আমরা ফিরে যাই। এখানে আমরা বাঁচব না। দেহ এবং আত্মা সবই মরবে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ-জায়গা মদনের পক্ষে আইডিয়েল। প্রথম পরীক্ষায় পুরো নম্বর পেয়েছে সে। একটা ইয়া-বড় অ্যাল্‌সেশিয়ান ওকে কামড়ে দিয়েছিল—তুমি তখন উত্থানের মধ্যে ঢুকেছ। কিন্তু পরে দেখলুম চামড়ায় ওর ফুটো-ফাটা কিছু নেই, অটুট। তাও তো মাত্র এক বছর বয়স মদনের। যৌবনে পা দিলে চামড়ার অবস্থা যে কী হবে কল্পনা করা যায় না।"

অনেকক্ষণ আগে থেকেই গজাননবাবু গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিলেন। মনের অবস্থা ভালো না। তিনি বললেন, "তোর এ-সব সিরিয়াস কথা আমার শুনতে ভালো লাগছে না। একটু হাল্‌কা ধরনের কথাবার্তা বল্।"

"সেইজন্য ভগবানকে দায়ী করো, গজুদা। আমি কি করব, তিনি আমায় হাল্‌কা কথা কইবার প্রতিভা থেকে বঞ্চিত করেছেন। মদনের মতো একটা সিরিয়াস জানোয়ারের ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তিনি

আমার হাতে তুলে দিলেন! যাক্‌গে, এখন কি করবে বলো। উইলিয়াম-তুগ্‌গের পাশে ব'সে থাকলে তো আর চলবে না। কোথায় যাবে? সুপতিদার ফ্ল্যাটে কি তোমার জায়গা হবে? আমি বাগবাজারে মামার ওখানে যাব। দিদিমা এখনো বেঁচে আছেন। তু'পাঁচ দিন সেখানে থাকতে পারব।"

"মদনের কি হবে?"

"মামার যদি প্রথম দৃষ্টিতে পছন্দ হ'য়ে যায়, তা হ'লে তিনতলার ছাদের ওপরে ওর থাকবার জায়গা হবে। দিদিমা একটু গোল বাধাতে পারেন। বড্ড সেকেলে—চোখে কুসংস্কারের ছানি পড়েছে। তিনি হয়তো মদনকে 'গণ্ডারের বাচ্চা' ব'লে গাল দিতে পারেন। তুমি কি করবে, গজুদা?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গজাননবাবু বললেন, "আমার তো মামা-টামা কেউ নেই। কালীঘাটে আজকের রাত্রিটা কাটাব—সেখানে যদি মানদাসুন্দরী থাকে, মানে, এখনো যদি বেঁচে থাকে তা হ'লে সে আমায় একটা রাত্রির জন্য জায়গা দেবে। কাল সকালে দলের লোকদের সঙ্গে দেখা করব।"

"মানদাসুন্দরী কে, গজুদা? নামটা যেন ঐতিহাসিক ব'লে মনে হচ্ছে?"

"কালীঘাটের হাফ-গেরস্থ। অনেকগুলো কামরা ভাড়া দিয়ে রেখেছিল। অগ্নিযুগ যখন দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠত তখন আমরা মানদা-মাসীর কাছে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। পুলিশ টের পেত না। বুঝলি তুলু, সেই যুগে মানদাসুন্দরীর কাছ থেকে আমরা যা সাহায্য পেয়েছি তেমন সাহায্য পুরোগেরস্থদের কাছ থেকেও পাইনি। যাক, অগ্নিযুগের কথা ভেবে আর লাভ নেই। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। তুলু, সুপতি পাকড়াশী ব'লে কোনো লোককে আমরা চিনি না। দেশ গড়বার কাজ যাঁরা করছেন তাঁরা আমাদের কেউ নন। আয়, আমরা এবার নিজেদের গড়বার কাজে লেগে

যাই। ব্যবসা করব, টাকা যা আসে তাই দিয়ে আমাদের তিন-জনের চ'লে গেলেই হ'ল।"

"তিনজন? গজুদা, তুমি কি পট্‌লীকে পাড়াগাঁয়ে ফেলে রাখতে চাও? মদ্‌নাকে ধ'রে আমরা চারজন হলুম না?"

"ও, হ্যাঁ। চারজন। শোন্‌, আমরা দু'দিনের ছুটি নিলুম। কলকাতা দেখে বেড়াই। তারপর এইখানে এসে আবার আমরা মিলিত হবো। আজ বেস্পতিবার। আমাদের দেখা হবে শনিবারে। সন্ধেবেলা, ঠিক এইখানে। তোর প্ল্যান-মতোই ব্যবসা করব। প্ল্যান আসবে স্বপ্নে। আমরা দুজনে যেদিন ঠিক একরকমের স্বপ্ন দেখব, তার পরের দিন থেকেই কাজকর্ম চালু হ'য়ে যাবে আমাদের। এই স্বপ্ন দেখার প্ল্যানও তোর। দুলু, আমার বিশ্বাস এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব তুই। কথা দিচ্ছি, পট্‌লী যদি অন্য কোনো নিকৃষ্টতর মানবের প্রেমে প'ড়ে গিয়ে না থাকে, তা হ'লে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবো তোর।"

"ভাঙা মেরুদণ্ড জোড়া লাগল আমার, গজুদা! বামুনের কথা সত্যি হবে, সত্যি হবে, সত্যি হবে। আমার প্ল্যানটা তা হ'লে তোমার মনে ধরেছে বলো? যেদিন আমরা দুজনে একরকমের স্বপ্ন দেখব—"

হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এল মদন। ঘেমে গিয়েছে গণ্ডারের বাচ্চা। ওর গায়ে হাত বুলতে গিয়ে চমকে উঠল দুলাল। পেটের দু'দিকে দুটো জয়ঢাক! ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে এতো খেয়েছে? উইলিয়াম-দুর্গের ভেতর থেকে হল্লা-চিৎকারের আওয়াজ শোনা গেল! একটু বাদেই মনে হ'ল বুটজুতোর ঠক ঠক শব্দ হচ্ছে। মদনকে বোধ হয় সেনাবাহিনী তাড়া করেছিল। দুর্গের ফটক দিয়ে একটা ব্যাটালিয়ান বেরিয়ে আসছে। গজাননবাবু বললেন, "সর্বনাশ করেছে! দুলাল স'রে পড়্‌—পালা। ট্যাক্সি ডাক্‌। এর পর পুরো ডিভিশন বেরুবে। গুলী ছুঁড়বে, কামান দাগবে। এই ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—"

একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে পড়ল। মদনকে ঠেলেঠুলে ট্যাক্সিতে তুলে দিল দুলাল।

গজাননবাবু বললেন, "আমি বাস্ ধরব। তুই চ'লে যা। দেরি করিস্‌নে। ঐ—ঐ শুনছিস ? মেশিনগান চালাচ্ছে !"

লাফিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল দুলাল। হাত-পা সব কাঁপছিল ওর। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে পারল না। ফস্‌কে গেল। বাইরে দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন গজানন মুখুজ্জে। দুলাল দত্ত দরজার কাছে মুখ আনতেও ভয় পেল। সে গদির গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে ডাকল, "দাদা, শোনো—"

"বল্ দুলু, বল্—" ঝুঁকে দাঁড়ালেন গজাননবাবু।

"তুমিও পালাও, গজুদা—সেকেণ্ড ব্যাটল্ অব পলাশী শুরু হয়েছে। আবার, আবার সেই কামানগর্জন !"

ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল।

চার

মানদাসুন্দরীকে খুঁজে বার করলেন গজাননবাবু। মাথার একটি চুলও আর কাঁচা নেই। সব পেকে গিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুর পরত আগে। বিয়ে যে তার কবে এবং কার সঙ্গে হয়েছিল তা কেউ জানত না। তবু সিঁদুর পরত সে। এখন দেখলেন, মানদাসুন্দরী বিধবা। ক্যালিকো মিলের সাদা ফিনফিনে শাড়ি পরেছে। গায়ের ব্লাউজটাও সাদা। দু'হাতে আগে সোনার চুড়ি ছিল কবজি থেকে কনুইএর তলা পর্যন্ত। এখন দুটো হাতই খালি। গজাননবাবু প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি বটে, কিন্তু মানদাসুন্দরী তাঁকে দেখামাত্রই চিনে ফেলল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মাসী, বাড়িটার নামকরণ করলে কবে ? সেই যুগে তো দরজার সামনে নাম-টাম কিছু দেখিনি। সুন্দর নাম দিয়েছ—গৃহস্থবাড়ি।"

"কি করব, পুব্ববঙ্গ থেকে দলে দলে লোক এসতে লাগল কিনা। কোথায় থাকে বল্? কামরাগুলো সব ভাড়া দিয়ে দিলুম। তুই কোত্থেকে এলি?"

"আন্দামান থেকে। দ্বীপান্তর হয়েছিল আমার।"

"তা এখন তো তোদেরই রাজত্তি। একটা উপ্‌গার করতে হবে। দিন-দিন কেবল ট্যাক্‌শো বাড়াচ্ছে ওরা। এই তো মাত্র ক'খানা চালাঘর—করপোরিশন না কোন্ এক চুলো আছে, সেখান থেকে লোক আসে। বলে, মাসী, ভাড়া বাড়ালে ট্যাক্‌শো বাড়বে না? তুই তো রাজত্তি করবি, নাথি ঝেঁটা মেরে ওদের এখন ঠাণ্ডা কর্। পারিস তো করপোরিশন চুলোটাকে তুলে দে। কই রে, সরোজিনী?—পুব্ববঙ্গ থেকে এয়েছে। সঙ্গে করে কিছুই আনতে পারেনি, শুধু নম্বা-নম্বা নাম। ডাকতে ভারি কষ্ট হয়। ইদিকে আয়—"

পনরো-ষোলো বছরের একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। মানদাসুন্দরী বলল, "স্বামীটাকে ওরা কেটেকুটে কোথায় ফেলে দিয়েছিল।—পেন্নাম্ কর্। করপোরিশনের ওরা ওকে দেখেছে। সেই থেকে মাছির মতো ভন ভন করে উড়ে বেড়াচ্ছে। যা, চা নিয়ে আয়, সরো—জিনী।"

"আজ রাত্তিরটা তোমার এখানে থাকব, মাসী। কাল সকালে গিয়ে সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করব। তারপর আর ভাবনা নেই। একবার গদিতে গিয়ে বসলেই তোমার ট্যাক্‌শো-ফ্যাক্‌শো সব কমিয়ে দেবো। তুমি তো দেখছি বিধবা, পোনামাছের দু'একটা টুকরো-টাকরা হেঁসেলে নেই? অনেকদিন দেশছাড়া তো। বলো, কেমন আছ। কাজ-কারবার কেমন চলছে।"

"পুব্ববঙ্গের জন্যই তো দুটি খেয়ে-প'রে আছি রে। নইলে নড়াই থেমে যাওয়ার পরে কারবারের পিদিম প্রায় নিবেই গেছল। একটু বোস্—দেখি, গাড়িতে ব'সে কে যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে।"

"স্বামীটাকে ওরা কেটেকুটে কোথায় ফে'লে দিয়েছিল।"

মানদাসুন্দরীর ক্ষিপ্র পদক্ষেপের দিকে চেয়ে গজাননবাবু ভাবলেন কাটা বাংলার রক্তের স্বাদ পেয়ে এ-অঞ্চলের মাসীরাও পুনর্জীবন লাভ করেছে। সবই তাঁর চোখে অদ্ভুত ঠেকছে আজ। বিকেল চারটের সময় জাহাজ থেকে নেমেছেন, এখন মাত্র আটটা। এই চার ঘণ্টার মধ্যে গোটা দেশটাই যেন দেখা হ'য়ে গেল। ইডেন-উদ্যান থেকে 'গৃহস্থবাড়ি' পর্যন্ত যা-কিছু দেখলেন সবই যেন বিরাট একটা কৌতুকাভিনয়ের ছোট ছোট দৃশ্য। সবাই ছুটছে, সবাই ব্যস্ত, সবাই গুরুগম্ভীর সুরে ভারি ভারি কথা বলে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, কাটা বাংলার ক্ষতটা বুঝি শুকিয়ে গিয়েছে। স্বামীটাকে কেটেকুটে ফেলে দেওয়ার পর সরোজিনীর সমস্যা আর নেই। সমস্যা মেটাবার ধরন দেখে বিচলিত বোধ করলেন গজাননবাবু।

একটু পরেই মানদাসুন্দরী ফিরে এল। গজাননবাবু দেখলেন, শাড়ির আঁচলে গিঁট বাঁধছে সে। মানদাসুন্দরী বলতে লাগল, "নোটগুলোও সব আগেকার মতো নেই, নম্বা নম্বা। লোকটি বড় ভালো। আগে স্বদেশী করত। এখন কারবার করে। আমরা এখন থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছি বিজয় মান্নাকে ভোট দোব। বলেছে, করপোরিশনের বারোটা বাজিয়ে দেবে সে। পুব্ববঙ্গের জন্য বিশ টাকা আগাম দিয়ে গেল। দিনরাত কাঁদে আর বলে, 'মাসী, ওদের জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে আমার। তোমার চালায় ওরা জায়গা পেয়েছে। আমরা তো কিছুই দিতে পারলুম নি। ধরো বিশটা টাকা—ওকে দিয়ো।' সরোজিনী আমার নক্ষ্মী। আহা, নড়াইটা থেমে যাওয়ার আগে যদি ওকে পেতুম! দেশ স্বাধীন হ'ল, আগে হ'ল না কেন?" মানদাসুন্দরী ভেংচে উঠল। গজাননবাবুর মনে হ'ল, এইজন্য 'গৃহস্থবাড়ি'র মাসী তাঁকেও অপরাধী করছে।

পরের দিন সকালবেলা কালীদার খোঁজ করতে বেরুলেন গজাননবাবু। রসা রোড আর রাসবিহারী অ্যাভিনূর মোড়ের

কাছে কোথায় যেন ফার্নিচারের দোকান খুলেছেন তিনি। অগ্নি-যুগের গোড়ার দিকে নাম-করা বিপ্লবী ছিলেন। বছর-দশেক জেল খাটবার পরে ব্লাডপ্রেসারে কষ্ট পেতে লাগলেন। পূর্ণদা বললেন, কালীর আর দেশের কাজ করবার দরকার নেই। ব্যবসা-বাণিজ্য করুক।

সেই থেকে কালীদা ফার্নিচার বিক্রি করেন। গুটিকয়েক ছেলেপুলে নিয়ে গোড়ার দিকে বড্ড বেশি বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন।

গজাননবাবু কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর পাশ দিয়ে দক্ষিণদিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। কালীদার দোকান এই ফুটপাথেই হবে। মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পর দোকানের সাইনবোর্ডটা চোখে পড়ল তাঁর। বিপ্লবী বাংলার একমাত্র ফার্নিচারের দোকান। নতুন সাইনবোর্ড লিখিয়েছেন কালীদা। স্বাধীনতার আগে ইতিহাসের এতো বড় ঘোষণাটি ওখানে লিখে রাখা অসম্ভব ছিল। কালীদা বাঙালী বটে, কিন্তু ব্যবসা বোঝেন।

দোকানঘরে ঢুকে পড়লেন গজানন মুখুজ্জে। সুন্দর অফিসটি। মস্ত বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলের চারদিকে গোটা-পাঁচ চেয়ার। সব ক'খানাই নতুন। মোমপালিশ-করা। টেবিলের ওপর রবারের গোল গোল চাক্‌তি প'ড়ে রয়েছে তিনটে। একটার ওপর জলের গেলাস। কালীদা বোধ হয় অফিসে ঢুকেই এক গেলাস জল খান।

পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলেন কালীচরণ দাশগুপ্ত। দু'চার সেকেণ্ড গজাননবাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কালীদা নাকি? না···হ্যাঁ, তিনিই তো! কালীবাবু কিন্তু গজানন মুখুজ্জেকে দেখেই চিনতে পারলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "গজা, তুই কোত্থেকে?"

"আন্দামান থেকে।"

"বোস্, বোস্,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ মোমপালিশ-করা চেয়ারেই বোস্।

কি বললি তুই, আন্দামান থেকে? ঠাট্টা করছিস নাকি?" পুরো এক গেলাস জলই খেয়ে ফেললেন কালীবাবু।

কী সাংঘাতিক পরিবর্তন হয়েছে কালীদার! গজাননবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কানের ছ'পাশ দিয়ে এক ইঞ্চি চওড়া জুল্‌পি রেখেছ কেন? আগে তো এসব কিছু বাড়তি সৌন্দর্য তোমার ছিল না—যতোদূব মনে পড়ে, কোনো জিনিসের বাহুল্য দেখলে তুমি রেগে উঠতে খুব।"

এরই মধ্যে বার-তিনেক টেলিফোন বেজে উঠল। কথা শুনতে শুনতে তিনি নিজেও বার-ছুই টেলিফোন করলেন। রিসিভারটা একধারে আলগা ক'রে ফেলে রেখে কালীবাবু বললেন, "এখন আর কেউ টেলিফোনে বিরক্ত করতে পারবে না। কতোদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, ছ'মিনিট কথা কইব তারও উপায় নেই। কি যেন জিজ্ঞেস কবছিলি তুই, গজা?"

"কানের ছ'পাশ দিয়ে কাঠবেড়ালেব ল্যাজেব মতো ছুটো জুল্‌পি রেখেছ কেন?"

হেসে ফেললেন কালীবাবু। বললেন, "খামোখা বাখিনি, এর তলায়ও বিপ্লববাদের ইতিহাস আছে। উনিশ-শো বাইশ সালে বরানগরে নেপেনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলুম। ভোর রাত্রে পুলিশ বাড়িটা ঘেরাও করলে। নেপেন বললে, দাদা, সব দিকের পথই বন্ধ। এখন পাইখানার ছাদের ওপর থেকে লাফ মেরে ডোবাব মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। নেপেনের পরামর্শমতো লাফ মারলুম। সারাটা দিন ডোবার মধ্যে মাথা গুঁজে প'ড়ে রইলুম। ডোবার চারপাশে ছিল মুচীদের বস্তি। মুচী-বউরা হেঁসেলের আবর্জনা আর উনোনের ছাই সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমার গায়ের ওপর ফেলতে লাগল। বিকেল চারটের মধ্যেই দেখি মাথাটা আর মাথা নেই, একটা ডাস্টবিন। সন্ধের পর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছি—পাইখানার ছাদের ওপর থেকে নেপেন শিস দিয়ে গান ধরল: বলো বলো

বলো সবে ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। অর্থাৎ রাস্তা সাফ, আমাকে উঠে আসতে বলছে নেপেন। উঠতে গিয়েই বিপদ ঘটল। বস্তির জানালা দিয়ে কে যেন একটা ভাঙা বোতল ছুঁড়ে ফেলে দিল ডোবায়। কানের পাশে বড় টুকরোটা এসে লাগল। কতো রকমের মলম লাগালুম, কিন্তু কাটা দাগটা আর গেল না। তোর বউদি বললেন, জুল্‌পিটাকে এক ইঞ্চি চওড়া করো। চওড়া করতে গিয়ে লম্বাও করতে হ'ল।"

"সেইজন্যই প্রথমে আমি তোমায় চিনতে পারিনি। যাক্‌গে, তারপর কাজ-কারবার কেমন চলছে, কালীদা ?"

"খু—ব খারাপ। মূলধন বড্ড কম। মাছের তেলে মাছ ভাজতে হয়। দশ বছর ধ'রে ব্যবসা করছি—একটু দাঁড়া, অমূল্যদাকে একবার টেলিফোন ক'রে নিই। তিনি আবার সাড়ে ন'টার সময় সুভাষ ইন্‌স্টিটিউটে যাবেন বক্তৃতা দিতে। কোনো নতুন কন্‌ট্রাক্ট সই করবার আগে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। রেট ঠিক ক'রে দেন অমূল্যদা।"

কালীবাবু টেলিফোন তুললেন। গোটা-চার কুলী এসে ঢুকে পড়ল অফিস-ঘরে। একটা আলমারি বার ক'রে নিয়ে গেল দুজনাতে ধরাধরি ক'রে। অন্য দুজন কুলী তুলে নিয়ে গেল তিনখানা চেয়ার। অফিসের বাইরে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে গজাননবাবু দেখলেন, ফার্নিচারগুলো একটা ট্রাকে বোঝাই করা হচ্ছে। ট্রাকের গায়ে লেখা রয়েছে কালীদার দোকানের নাম। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ট্রাক যে এটা নয়, তা তিনি সহজেই বুঝতে পারলেন। একেবারে আনকোরা নতুন কেনা ব'লে নিঃসন্দেহ হলেন গজানন মুখুজ্জে।

টেলিফোনে কথা শেষ ক'রে কালীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর গজা, কি করছিস, কেমন আছিস বল্‌ ?"

"আন্দামানে ভালোই ছিলুম।"

"ঠাট্টা করছিস নাকি রে? আমায় আবার এক্ষুনি বেরুতে হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার আজ শেষ তারিখ। মস্ত বড় কনট্রাক্ট—তিনতলা একটা অফিস খুলছে গভর্নমেণ্ট, সব সাজিয়ে-গুজিয়ে দিতে হবে আমাকে। স্বাধীনতার পর এঁদের কাজ বেড়েছে দশগুণ।" ঘড়ি দেখলেন কালীবাবু। "পূর্ণদার সঙ্গে দেখা-টেখা হয় রে? মহিম হালদার স্ট্রীটে তাঁর অফিস। রিফিউজীদের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন তিনি। দিন-রাত্তির খাটুনি। মাগ্‌নীরাম বাঙ্গুর খুব শস্তায় টালিগঞ্জের দিকে জমি বিক্রি করছে। চার-পাঁচ কাঠার একটা প্লট কিনে ফেল্, গজা। হুহু ক'রে দাম বাড়ছে।"

"কাল ফিরলুম—"

"কোথায় ছিলি এতোকাল?"

"আন্দামানে।"

"সুপতিদা জানতেন?"

"সাতচল্লিশ সালের আগস্ট থেকে আটচল্লিশের মে পর্যন্ত জানতেন না। যে-ফাইলে আমাদের নাম লেখা ছিল সেটা হারিয়ে গিয়েছিল।"

"বলিস কি, গজা? এ যে অরাজকতা!"

"সুপতিদার দোষ নেই। ব্রিটিশ আমলের একজন হেড-ক্লার্ক ভুল ক'রে ফাইলটা নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। হেড-ক্লার্কের গিন্নী আবার সেই মূল্যবান ফাইলটাকে যত্ন ক'রে সরিয়ে রেখেছিলেন খাটের তলায়। মস্ত ইতিহাস, কালীদা!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গজাননবাবুই বললেন, "এখন ভাবছি, ফাইলটা যদি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত তা হ'লে বেঁচে যেতুম আমি। বেঁচে যেত আরও একজন—"

শিখণ্ডীর মতো হুটো কুলী এসে হু'দিকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। কালীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তাঁকে দেখে

গজানন মুখুজ্জেও উঠে দাঁড়ালেন। কুলী দুটো ছোঁ মেরে চেয়ার দু'খানা তুলে নিয়ে চ'লে গেল বাইরে। কালীবাবু যেন ফুর্তির সুরে বলতে লাগলেন, "কাল বিকেলে অমূল্যদার মারফত হঠাৎ একটা আরজেণ্ট অর্ডার পেলুম। কারখানায় তৈরি মাল আর ছিল না। গজা, এই টেবিলটার ওপর না-হয় উঠে বোস্। আজই আমি সুপতিদাকে বলব—"

"কি বলবে ?"

"এই গল্পটা। হেড-ক্লার্কের দফা রফা হ'য়ে যাবে। এই সব ভ্যালুয়েবল্ জীবন নিয়ে চালাকি করার মানে কি ?"

"চালাকি নয়, কালীদা—" টেবিলের কাছ থেকে স'রে দাঁড়ালেন গজাননবাবু।

কুলীরা আবার ফিরে এসেছে। এই টেবিলটাকেও ট্রাকে তোলা হবে।

কালীবাবু বললেন, "আয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করি। আরজেণ্ট অর্ডার কিনা। তারপর, বৌমা কেমন আছেন ? অনেক-দিন তো তা হ'লে তোর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি ?"

"না। বাসী-বিয়ের দিন সকালবেলা আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। প্রায় পনরো বছর হ'য়ে গেল।"

"ইস্! সময় কি তাড়াতাড়ি কেটে যায়! চল্ বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। ওরা এবার বড় আলমারি দুটোও বার করবে।"

একেবারে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। এবার আর মুখোমুখি নয়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলেন। কালীবাবু বললেন, "তা হ'লে তো দেখছি সারাটা জীবন তোকে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হ'ল। কতো বয়স হ'ল রে তোর ? আমার চেয়ে তুই অন্তত বছর পাঁচেকের ছোট হবি।"

"তা প্রায় পঞ্চাশ হ'তে চলল।"

"তা হোক, শক্তসমর্থ আছিস। বৌমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি গিয়ে

দেখা কর্। যাবি নাকি পূর্ণদার ওখানে? ব্যাঙ্কে যাওয়ার পথে তাঁর অফিসে তোকে নামিয়ে দিয়ে যাই। তোকে দেখলে তিনি খুব খুশি হবেন।”

একটা গাড়ি এসে সামনে দাঁড়ালো। নতুন গাড়ি। কালীবাবু দরজা খুলে গাড়িতে উঠে বসলেন। দরজাটা বন্ধও করলেন তিনি। পূর্ণদার ওখানে যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল গজানন মুখুজ্জের। কিন্তু ইচ্ছেটা প্রকাশ করার আগেই কালীবাবু বললেন, “আবার একদিন আসিস, গজা। আজ একটু ব্যস্ত আছি।”

রাসবিহারী অ্যাভিনুর দিকে গাড়িটা বেরিয়ে গেল। পূর্ণদার কাছে গিয়ে আর লাভ নেই। রিফিউজীদের ভবিষ্যৎ তিনি দেখতে পেয়েছেন। পুবদিকের ফুটপাথ ধ'রে গজাননবাবু আবার কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর দিকেই হাঁটতে লাগলেন। কী সাংঘাতিক ভিড়! অফিস টাইম। ট্রাম ধরবার জন্য সবাই ছুটছে। এই সময়টাতে কলকাতায় বোধ হয় কেউ আর হাঁটে না। ধাক্কা খেয়ে গজাননবাবু ট্রাম-ডিপোর দেয়ালের দিকে স'রে দাঁড়ালেন। অনেক আগেই তাঁর ফুটপাথ থেকে নেমে যাওয়া উচিত ছিল। হয়তো অফিস-টাইমে তাঁর পথে বেরুনোই অন্যায় হয়েছে। বেকারদের পথে বেরুবার সময় এটা নয়। কপালের ঘাম মুছলেন গজানন মুখুজ্জে।

সত্যিই বেকার তিনি। কিছুই করবার নেই। মেয়েটাকে দেখতে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল। পকেটে যে ক'টা টাকা আছে তা দিয়ে হয়তো জনার্দনপুরে পৌঁছনো চলবে, কিন্তু ফিরে আসবার টিকিট-ভাড়া থাকবে না। বাকী জীবনটা জনার্দনপুরে ব'সে করবেনই বা কি? যা-হোক একটা কাজ এখানেই জুটিয়ে নিতে হবে। দুলালের প্ল্যানটাও মন্দ নয়। প্ল্যান আসবে স্বপ্নে। এ পর্যন্ত অনেক রকমের স্বপ্নই দেখেছেন তিনি। কাল তো মাসীর ওখানে খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে শুতে প্রায় রাত একটা বেজে গিয়েছিল। তবুও ভোর-রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন গজাননবাবু।

কালীঘাট পার্কে ঢুকে পড়লেন তিনি।

গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ থেকে নোট-বই বার করলেন। স্বপ্নটা লিখে রাখতে হবে। দুলাল কী দেখল তার সঙ্গে আবার মেলা চাই। গোটা নোট-বইটাতে আর কিছু লেখা নেই, শুধু স্বপ্নের কথা। দুলালের কাছেও একটা নোট-বই আছে। চিন্তা করতে বসলেন গজাননবাবু। স্বপ্নটা যেন কাল কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? একটা সাইনবোর্ড থেকে। গজাননবাবু মস্ত বড় একটা অফিস খুলেছেন। তিনতলা অফিস। বত্রিশটা কামরা। তিনি কোম্পানিটার ম্যানেজিং ডিরেক্টার, দুলাল জেনারেল ম্যানেজার। বিরাট কারবার চলেছে সারা দেশ জুড়ে। কিসের কারবার যেন? আমদানি-রপ্তানি নয়। পারমিট লাগে না। ফরেন-এক্সচেঞ্জের ঝামেলা নেই। তবে কি লোহা, ইস্পাত কিংবা কাপড়ের কারখানা খুলেছেন? না, তাও তো নয়। ঠিকেদারি ব্যবসা? অসম্ভব। কৃপাল সিং-কে কাল নিয়ে তিনবার তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু ব্যবসার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। হয়তো সে গজাননবাবুর দর্শনলাভের জন্য অফিসে এসেছিল। প্রকৃতপক্ষে, কৃপাল সিং স্বপ্নের অফিসে এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিন দিনই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গজানন মুখুজ্জের। গতরাত্রেও সর্বনাশ ঘটালো কৃপাল সিং। কী নিয়ে যে এতো বড় অফিসটা চলছে সেটা জানবার একটু আগেই ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল তাঁর, ঠিকেদারটা বুঝি মাসীর বাড়ি থেকে তক্ষুনি বেরিয়ে গেল। পাগড়িটাও যেন গজাননবাবুর চোখের মণি থেকে তখনো পুরোপুরিভাবে মিলিয়ে যায়নি। ব্যাটা, মরবার আর জায়গা পেল না, একেবারে হাফ-গেরস্থদের পাড়ায় এসে উপস্থিত হ'ল! খুবই রেগে গিয়েছিলেন গজাননবাবু।

যাই হোক, নোট-বইতে কৃপাল সিং-এর নাম লেখার দরকার নেই। বাকী সবটা লিখে ফেললেন তিনি। আগামীকাল দুলালের

স্বপ্নের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। হয়তো শেষটুকু দুলাল জানতে পেরেছে। এমন একজন উৎকৃষ্ট মানবের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় মনে মনে গর্ব বোধ করলেন মুখুজ্জেমশাই। পটলী যদি অন্য কারো সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে না থাকে, তা হ'লে দুলালকে তিনি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেনই। তিনি অগ্নিযুগের মানুষ—বিপ্লবী। জাত-বিভাগের বস্তাপচা সংস্কার তিনি মানবেন না।

পার্কে ব'সেই গজাননবাবু দেখলেন, ফুটপাথ দিয়ে কেউ আর দৌড়চ্ছে না। হাঁটতে আরম্ভ করেছে লোক। তিনিও উঠে পড়লেন।

॥ পাঁচ ॥

গণ্ডারের বাচ্চাকে ট্যাক্সিতে তুলেছে ব'লে একটা টাকা বেশি ভাড়া দিতে হ'ল। প্রতিবাদ করেছিল দুলাল। শিখ-ড্রাইভার প্রতিবাদের প্রতি কর্ণপাত করল না। পাঁচ টাকার চেঞ্জটা দুলালের হাতে দিয়ে গাড়ি চালিয়ে চ'লে গেল সে। দুলাল হিসেব ক'রে দেখল, মিটারে যা উঠেছিল তার চেয়ে এক টাকা বেশি নিয়েছে ড্রাইভার। জাহাজে মদনের জন্য টিকিট কাটতে হয়নি, ট্যাক্সিতে ভাড়া লাগল। ক্যাপটেন ড্রেক আর পাঞ্জাবী ট্যাক্সি-চালকের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাত তাতে আর সন্দেহ নেই।

দুলালের মামা মাত্র একটি। রাঘবেন্দ্র বসু-রায়। বাগবাজারের বাড়িটা তিনপুরুষের পুরনো। দাদামশাই তাঁর বাবার কাছ থেকে কিছু নগদ টাকা পেয়েছিলেন। চাকরি কিংবা ব্যবসা তিনি করেননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নগদ টাকা ভেঙেই সংসার চালিয়ে গেছেন। তিনি জানতেন, শ্মশানের খরচপত্র যোগাড় করতে রাঘবের কষ্ট হবে। দাদামশাই তাই মরবার আগেই পাঁচ মণ চন্দনকাঠ কিনে রেখেছিলেন। রাঘবকে বিশ্বাস করতেন

না। পাঁচ মণ চন্দনকাঠ সে হয়তো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটে জলের দামে বেচে দিতে পারে। সতর্কতা অবলম্বন করলেন তিনি। চিলেকোঠায় কাঠ রেখে তালা লাগিয়ে দিলেন। চাবিটা প্রথম প্রথম তাঁর বালিশের তলায় থাকত। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে চাবিটা তিনি মাত্বলির মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখলেন। শ্মশানের কাজ শেষ ক'রে রাঘবমামা রিক্‌শা চেপে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন। সিন্দুক খুললেন। চোরা খুপরিটা খুঁজে পেলেন বটে, কিন্তু নগদ টাকার অঙ্কটা হাতের চেটোর ওপর ফেলে রেখে চোখের জলে মেঝেটা ভিজোতে লাগলেন তিনি। দিদিমার শোক তখন অনেকটা কমে এসেছে। ছেলের শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি বললেন, "পঁচাত্তর বছর বয়স হয়েছিল, তোর বাবা তো ঠিক সময়েই মারা গেলেন। বুড়ো বাপের জন্য এতো বেশি কাঁদিস্‌নে। ওঠ্। আমি তো গহনা পরব না, প্রায় ভরি-পঞ্চাশ আমার কাছে আছে। তোকে দোব।"

রাঘবেন্দ্র বসু-রায়ও আগে কিংবা পরে কোনোদিনই চাকরি করেননি। পঞ্চাশ ভরি ফুরোবার পর দিদিমার কাছ থেকে আরও পঁচিশ ভরি পাকা সোনা পেয়েছিলেন তিনি। তারপর একতলার ছ'খানা ঘরকে দু'ভাগ করলেন। মাঝখানে কাঠের পার্টিশন লাগিয়ে দুটি অংশই ভাড়া দিয়ে দিলেন। একটা রসিদ-বই ছাপিয়ে তাতে লিখলেন : এস্‌টেট রাঘবেন্দ্র বসু-রায়। চিঠির কাগজেও নিজের নামের পেছনে ছাপিয়ে নিলেন : ল্যাণ্ডলর্ড। সেই থেকে বাগবাজার অঞ্চলে মামাকে আর কেউ নাম ধরে ডাকত না। তিনি শুধু ল্যাণ্ডলর্ড হ'য়ে রইলেন। ফলে, সাম্প্রতিক কালের যুবকরা তাঁর নাম গেল ভুলে। এদের কাছে তিনি 'ল্যাণ্ডলর্ড-দা'। গোড়ার দিকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেতেন, পরে মোহনবাগানের মেম্বার হলেন। ফুটবল খেলা ভালো লাগত না তাঁর। বুঝতেনও না। শুধু চেয়ে থাকতেন গোল-পোস্টের দিকে। মোহনবাগান

ক্লাবের হার-জিতের ওপর তাঁর জুয়াখেলার হার-জিত নির্ভর করত। দিদিমা বলতেন, "রঘু যদি বারোত্বয়ারীতে গিয়ে দিশী মদ খেত তাতেও এতো বেশি টাকা নষ্ট হ'ত না।" দিদিমার কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া সত্ত্বেও রাঘবমামা চরিত্র নষ্ট করেননি। বারোত্বয়ারী নেশাখানাটা কলকাতায় না লণ্ডনে, তার খবর রাখেন না ল্যাণ্ডলর্ড রাঘবেন্দ্র বসু-রায়।

প্রায় বছর-দশেক পরে মামাবাড়িতে এল তুলাল। বাড়িটা চিনতে পারছিল না। বাড়ির সামনে একটা মস্ত বড় গেট ছিল। লম্বা লম্বা লোহার শিকের মাথায় এক-একটা ক'রে মাছ বসানো ছিল। মাছের নকশাটা পছন্দ ক'রে দিয়েছিলেন দাদামশাই নিজে। এখন গেট ব'লে কিছু নেই। সামনেটা একেবারে ফাঁকা। বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল তুলাল। গাড়িবারান্দার ওপরে একটা আলো জ্বলছে। পাওয়ার খুব কম। এতে আলো জ্বালাবার নিয়ম রক্ষা হচ্ছে বটে, কিন্তু রাস্তাঘাট দেখবার সুবিধে হচ্ছে না। বাল্‌বের গায়ে ধুলো জ'মে জ'মে নতুন একটা খোলসের সৃষ্টি হয়েছে। খোলসটা ভেদ ক'রে আলো যখন বেরিয়ে আসে তখন তার তেজ যায় ক'মে। সঙ্গে সঙ্গে রংটাও বদলায়।

তু'দিকে তুটো ফ্ল্যাট, মাঝখানে একটা সরুমতো পথ। এই পথ ধ'রেই সবাই যাওয়া-আসা করে এবং দোতলায় উঠবার সিঁড়িও এইখানে। ভেতরে ঢোকবার আগে তুলাল একটু থমকে দাঁড়িয়ে গেল। প্রবেশপথের বাইরে দেয়ালের গায়ে বটগাছ জন্মেছে। প্রতিটি গাছ অন্তত তু'ফুট ক'রে উঁচু। বটগাছের কচি-কচি পাতাগুলো নজরে পড়েছে মদনেরও। অন্ধকার সরু পথের মধ্যে ঢুকে পড়ল তুলাল।

সিঁড়িতে আলো নেই। রেলিংটা ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল সে। ওখানে দাঁড়িয়ে বার-তুই 'মামা, রঘুমামা' ব'লে ডাকল। দোতলা থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। মামা কি দোতলাটাও

ভাড়া দিয়ে দিলেন নাকি ? তৃতীয়বার মামাকে ডাকতে যাবে এমন সময় ল্যাণ্ডলর্ড বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকলেন। সিঁড়ির কাছে এসে তিনি চমকে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "কে ? কে ওখানে ?"

"আমি মামা—"

"আমি কে ?" ধমকে উঠলেন ল্যাণ্ডলর্ড।

"আমি ছুলাল।"

"ছুলাল ? তুই কোত্থেকে এলি ?"

"আন্দামান থেকে।"

"বলিস কি রে! আমি তো তোকে সারা ভারতবর্ষে খুঁজে মরছি। মাকে নিয়ে পুরী গেছলুম। সেখানে গিয়ে উড়িয়াদের জিজ্ঞেস করলুম, ওদের দেশে ছুলাল দত্ত ব'লে কেউ মন্ত্রী হয়েছে কিনা। যাক, বাঁচলুম। তোর রেকর্ড ভালো। এবার এখানেই একটা উঁচু গদিতে—" দেশলাই জ্বাললেন রাঘবেন্দ্র বসু-রায়, "দেখি, এতোকাল আন্দামান দ্বীপে বাস ক'রে চেহারাটা কেমন হয়েছে—আরে, পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে কে ?" কাঠির বারুদটুকু পুড়ে গেল।

"ও আমার সঙ্গেই এক-জাহাজে এসেছে।"

"ও কে ?"

"গণ্ডারের বাচ্চা। মদন ব'লে ডাকলে সাড়া দেবে।"

"হ্যাঁ রে ছুলাল, তুই কি ভারতবর্ষের কোনো খবর রাখিস না ?"

"কেন মামা ?"

"এখানে যে বাচ্চা ধেড়ে নানান বয়সের গণ্ডারে দেশটা ছেয়ে গেছে। তার ওপরে খাদ্যসঙ্কট তো লেগেই আছে। ওকে খেতে দিবি কি ?"

"কচি-কচি গাছপাতা খায় মদন। তোমার এখানে অল্প আলোয় যা দেখলুম তাতে মনে হয় বছরখানেকের খোরাক ওর শুধু সামনের

দেয়ালে মজুত রয়েছে। মামা, তুমি কি সবগুলো দেয়ালেই বন-মহোৎসব করেছ ? যাক্‌কে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, তোমার এখানে দিন-সাতেকের জন্য জায়গা হবে কি ?”

“দিন-সাতেক কি বে! যতোদিন ইচ্ছে থাক্‌। এখন তো তোদেরই রাজত্তি চলেছে। শোন্‌ দুলাল—মুরুব্বীদের ধ'রে লোহা আর সিমেণ্টের পারমিট যোগাড় ক'রে দিতে হবে। চল্‌, ওপরে চল্‌। মদনকে চিলেকোঠায় জায়গা দেবো। শোন্‌ দুলাল, তোদের সেই বাগনানের নেতা বিজয় মান্নাকে মনে আছে তো ? সে রাজা-ফাজা কিছু হয়নি। মস্ত খলিফা-লোক। যাঁবা রাজত্ব চালাচ্ছেন বিজয় মান্না তাঁদের চালায়। আমি গেছলুম তাঁর কাছে। তোব পবিচয় দিয়ে বললুম যে, দু' টন সিমেণ্টের পাবমিট কবিয়ে দিন। ব্যাটা বললে কি জানিস ?···চল্‌, মায়েব সঙ্গে দেখা কববি। প্রত্যেকদিন তিনি তোর নাম না ক'রে জলগ্রহণ করেন না। আজকের খবর জানিস, দুলাল ? মোহনবাগান ঈস্টবেঙ্গলকে দু' গোলে হারিয়ে দিয়েছে !”

“দেবেই তো। এখন তো ঈস্টবেঙ্গল-এরই হাববার সময়। মামা, মাঠে নামবাব আগেই আমবা ওদেব হাবিয়ে দিয়েছি। ইডেন-উদ্যানের দক্ষিণদিকে দেখলুম, তাঁবুব নিচে কেঁচোব মতো কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ কিলবিল করছে। একজন বাঙালী সেপাইকে জিজ্ঞেস করলুম, ওরা কারা। সে বললে, রিফিউজী। মামা, বিজয় মান্না কি আমাকে চিনতে পারল ?”

“নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমাকে চা খাওয়ালে। বললে যে, দুলাল ফিরে আসুক। দু' টন নয়, একবাবে দশ টন দিয়ে দেবো। আগেই কিন্তু ব'লে রাখছি ভাগ্নে, পাঁচ টন ব্ল্যাকে ঝাড়ব·· তুই যা, মাকে প্রণাম কোর্‌গে যা। আমি বরং পোয়াটাক মটন কিনে নিয়ে আসি। ও-বেলা খাইনি, রাগ ক'রে মাঠে গিয়ে ব'সে ছিলুম। মাসেব মধ্যে একুশ দিনই কি মসুর ডাল আব নটে-শাক খেতে

ভালো লাগে ? তোর 'অনারে' আজ মটনের দো-পেঁয়াজী চালানো যাবে। যা, ওপরে যা। তোর মামীমার আবার শরীর খারাপ। কি যে মুশকিলে পড়েছি—বছর বছর মা-ষষ্ঠী এসে একটি ক'রে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। ঝামেলার আর শেষ নেই, তুলাল। তার ওপরে করপোরেশন আবার ট্যাক্স বাড়িয়ে যাচ্ছে। ছ' কোয়ার্টার বাকী পড়েছে—"

নিশ্চিন্ত মনে বাকী সিঁড়ি ক'টা উঠে গেল তুলাল। সাত দিনের জন্য অন্তত আশ্রয় পাওয়া গেল। পারমিটের খেলাটা ভালো ক'রে জমাতে পারলে এক মাস ব'সে খেলেও মামা আপত্তি করবেন না। মদনের জন্যও ভাবনা নেই। তারও জায়গা হ'য়ে গেল তিনতলার চিলেকোঠায়। সিমেণ্ট আর লোহার স্বপ্নের মধ্যে মামাকে শুধু ক'টা দিন ডুবিয়ে রাখতে পারলেই হ'ল।

পোয়াটাক মাংসের মটন দো-পেঁয়াজী রান্না হ'ল। তুলালের 'অনারে' রান্না হয়েছে ব'লে মামা বললেন, "ওকে তু' টুকরো দাও, আর সবাই এক টুকরো ক'রে পাবে।"

দো-পেঁয়াজী খেয়ে একটা ঢেকুর পর্যন্ত উঠল না, অথচ ভোর-বেলায়ই মামা এসে তুলালকে ঘুম থেকে তুললেন। পারমিটের জন্য এখন থেকেই চেষ্টা করতে হবে। সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি। যতো তাড়াতাড়ি বার করা যায় ততোই মঙ্গল।

তুলাল বুঝতে পারলে, মামাকে যতো বোকা ভেবেছিল ততো বোকা লোক তিনি নন। তাঁকে খেলিয়ে রাখা মুশকিল হবে। তুলালের ক্ষমতা কতোটুকু, তার দ্বারা আদৌ পারমিট বার করা সম্ভব হবে কিনা সেই সম্বন্ধে রাঘবমামা প্রথম দিনেই জ্ঞানল ভর চেষ্টা করছেন। তুলালকে নিয়ে মুরুব্বীদের কাছে পৌঁছতে পারলেই তাঁদের হাবভাব থেকে ভবিষ্যৎ-কৃতকার্যতার পারসেন্টেজ বুঝতে সুবিধে হবে তাঁর। তুলালকে যদি তাঁরা পাত্তাই না দেয়, তা

হ'লে একটা জোয়ানমর্দ ছোকরাকে ঘরে বসিয়ে তিনিই বা তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবেন কেন? মামা হ'লেই বুঝি তাঁকে ক্ষতি স্বীকার করতে হবে? তা হ'লে তিনি দুলালের মামা হ'তে চান না। হু-হু ক'রে জিনিসের দাম বাড়ছে—এমন সাংঘাতিক বাজারে স্বামী এবং বাপ হ'য়েই বিপদে পড়েছেন তিনি। তার ওপরে মামাগিরি করতে গেলে তো পৈতৃক বাড়িখানাও বেচে ফেলতে হবে। প্রথম ভদ্রতার জন্য তিনি তো পোয়াটাক মটন কাল কিনেই ফেলেছিলেন। রুমালের গিঁট খুলে দাম দিতেও দ্বিধা করেননি। আহা বেচারী দশ বছর পর মামাবাড়িতে এল, মাংস তো খাবেই! কিন্তু ভাগ্নের দিক থেকেও তো সাড়া পাওয়া চাই। আজকাল আর কোনো রাস্তাতেই ওয়ানওয়ে ট্রাফিক নেই—সব টু-ওয়ে। পুলিশ-কমিশনারকে জিজ্ঞেস করলেই কলকাতার খবর সব জানতে পারা যাবে। দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে পাশ ফিরলেন রাঘবমামা। ঘুম কিছুতেই আসছে না। সাতচল্লিশ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এটা আটচল্লিশের জুন। দুলাল কেন তবে এতোদিন আন্দামানে রইল? জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য ওকে কেন ডাকা হ'ল না? তবে কি দুলালের কোনো দাম নেই? ভস ভস ক'রে গোটা-দুই দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি। দেয়াল ঘেঁষে শোবার চেষ্টা করলেন। ভন্তু আর নন্তু দুজনেই একসঙ্গে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। এখন ঐ দেয়ালের দিকে মুখ ক'রেই বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিতে হবে। রাগে সারা শরীর গরম হ'য়ে উঠল তাঁর। নন্তুর পরে আরও একজন আসছে। কী নাম হবে তার? নন্তুর পরে জন্তু ছাড়া আর তো কিছু জন্মাতে পারে না! গালি দিতে পারলেই মা-ষষ্ঠী বোধ হয় বাগবাজারে আসা বন্ধ ক'রে দেবেন।

সারারাত ঘুমতে পারেননি, তবু তিনি ভোরবেলায়ই শয্যা ত্যাগ করলেন। কি জানি বলা যায় না, দুলাল হয়তো সকালবেলা চা

না খেয়েই বেরিয়ে যাবে। তারপর বাড়ি ফিরবে তুপুরে, একেবারে ভাত খাওয়ার সময়। চান ক'রে খেয়ে-দেয়ে উঠতে উঠতে তুটো বেজে যাবে। একটা পুরো দিন যাবে নষ্ট হ'য়ে।

তুলালের খোঁজ করতে এসে তিনি দেখলেন, চৌকির তলায় বিছানা পেতে শুয়েছে সে। প্রথমে খোঁচা মারলেন, তারপর গুঁতো। কী সাংঘাতিক ঘুম রে বাবা! ছোট্ট চৌকি। রাঘবমামা চৌকিটাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে তুলালের পাশেই ব'সে পড়লেন।

তুলাল বলল, "এই তো সবে রাত তিনটের সময় ঘুমতে গেলুম। মামা, ছাদে কি তোমার কিছুই নেই? সিমেণ্ট-সুরকি ক্ষ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু এ কি, হড় হড় ক'রে জল পড়তে লাগল সারা ঘরময়? আমার মনে হ'ল, বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছাদে আটকায়নি, সোজা মেঝের ওপর এসে থেঁৎলে পড়তে লাগল। এ প্রায় খোলা ময়দানে শোয়ার মতো। শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হ'য়ে চৌকির তলায় বিছানা পেতে নিলুম।"

"সেইজন্যই তো পারমিটটা তাড়াতাড়ি বার করতে চাই, তুলাল। উঠে পড়্, চা খেয়ে নে। তারপর চল্ বেরিয়ে পড়ি।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো। আচ্ছা মামা, কাল রাত্রে তো কিছুই দেখতে পাইনি। চিলেকোঠা ব'লে যে-ঘরটায় মদনকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দিলে, সেটা সত্যিই ঘর তো? মাথার ওপরে ছাদ-ফাদ কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই?"

"এতোদিন আন্দামানে আটকে ছিলি এদিককার খবর কিছু রাখিস না। আমি ছাড়া কলকাতায় আরও শত শত ল্যাণ্ডলর্ড বাস করে। চিলেকোঠায় একটা কন্‌ক্রিটের ছাদ জমিয়ে দিতে পারলেই একশো টাকায় ভাড়া হ'য়ে যায়। মাদ্রাজী ভাড়াটেদের রান্নাঘর পর্যন্ত দরকার হয় না। একতলায় নেমে গিয়ে বাথরুম ব্যবহার করে।"

"তা হ'লে কাল রাত্রিতে মদন খুব কষ্ট পেয়েছে। ওকে গালাগাল দাও, লাথি মারো, ইটপাটকেল কিংবা লেমনেড-সোডার বোতল ছুঁড়ে মারো, এমনকি যাচ্ছেতাই সম্পাদকীয় লিখে লিখে জখম করবার চেষ্টা করো, তাতেও ওর দেহে কিংবা মনে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে লাগলেই, বুঝলে মামা, কেমন জড়োসড়ো মেরে যায়।"

"শ্লেষ্মার ধাত বুঝি ?"

"স্টেথেসকোপ লাগানো হয়নি। ভাবছি, বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সব-কিছু ওর চেক্ করিয়ে নেব। ব্লাড, ইউরিন কিছুই বাদ দেবো না। ওকে নিয়েই আমার ভাবনা, মামা —"

"তা হ'লে উঠে পড়্, বিজয় মান্নার কাছে আগে চল্। চিলে-কোঠার ভাঙা টালি সব ফেলে দিয়ে ঢালাই ছাদ বসাব ওখানে।"

মোড়ামুড়ি দিতে লাগল দুলাল। বার-পাঁচেক হাই তুলল। ধুতি-পাঞ্জাবি প'রেই মামা ঘরে ঢুকেছেন। বাইরে বেরুবার জন্য তিনি প্রস্তুত। বড়জোর এদিক-ওদিক ক'রে আধঘণ্টা-খানেক সময় আর পাওয়া যেতে পারে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে বসতে হ'ল। সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা করল দুলাল, "মামা, আন্দামানের গল্প শুনবে একটা ? ভা-রি সুন্দর জায়গা। জাপানীরা যখন এসে দখল করল--"

"দুপুরবেলা অনেক সময় পাওয়া যাবে। সকাল আটটার আগে পৌঁছতে না পারলে বড় বড় লোকেরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কলকাতা হচ্ছে গিয়ে কাজের জায়গা।"

"এতো কি কাজ করেন এঁরা ?" বালিশের পাশ থেকে পাঞ্জাবিটা তুলল দুলাল। ঘরে একটা আলনা ছিল বটে, কিন্তু সেটাও ভিজে ভিজে সাদা হ'য়ে গেছে। গতরাত্রে আলনাটাকে ঘরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সরিয়ে রাখতে গিয়ে দুলাল দেখল, সর্বত্রই জল পড়ছে।

পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে তুলাল বলল, "চলো, বেরিয়ে পড়ি। সিমেণ্টের পারমিটটা আগে বার করতে হবে। বাইরে কোথাও চা খেয়ে নেব। মামা, ব্ল্যাকের খদ্দের ঠিক আছে তো?"

"ওদের সংখ্যা এতো বেড়েছে যে, আজকাল আর খোঁজ করতে হয় না। শিস দিলেই সামনে এসে ভিড় করে। চল্, বাসে ব'সে কলকাতার আরও গল্প শোনাব।"

"হ্যাঁ, তাই ভালো। বাথরুমের কাজটা না হয় বিজয় মান্নার ওখানেই সেরে নেওয়া যাবে—"

একটা একটা ক'রে প্রত্যেকটা বোতাম লাগালে তুলাল। যাওয়ার জন্য সে যে খুবই উদ্‌গ্রীব রঘুমামা এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।

এই সময় ভন্তুর বড় ভাই সন্তু এসে ঘরে ঢুকল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে, "এই যে বাবা! তুমি এখানে ব'সে গল্প করছ—শিগ্‌গীর এসো, দেরি কোরো না—"

"কেন, কি হ'ল?"

"মায়ের ব্যথা উঠেছে—দাইকে ডেকে নিয়ে এসো।"

"তোর মা এখন কোথায়?"

"আঁতুড়ঘরে ঢুকে পড়েছেন।"

সন্তুর সঙ্গে সঙ্গে তুলালও তাড়া দিতে লাগল, "শিগ্‌গীর বেরিয়ে পড়ো, মামা। দাই ডাকতে কতোদূর যেতে হবে? ট্রামে-বাসে উঠো না। এখন তাড়াতাড়ির সময়। যাওয়ার পথেই একটা ট্যাক্সি ধ'রে নিয়ো।"

"যাচ্ছি। সন্তু, তুই যা। ছাখ্ গে, নন্তু আবার খাটের ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে মাটিতে না প'ড়ে যায়। নন্তুটা দেখতে ঠিক তোর মতো হয়েছে, বুঝলি তুলাল?"

"তাই নাকি?" দরজার দিকে এগিয়ে গেল তুলাল। রাঘব-মামা ফস ক'রে তুলালের পাঞ্জাবিটা টেনে ধ'রে বললেন, "শোন্—

দেখছিস তো মাথার ওপরে কতো বড় বিপদ আমার! দুটো টাকা আমায় ধার দে।"

"দেওয়ার ইচ্ছে আমার ষোলো আনা। কিন্তু কি করব মামা, কাল ট্যাক্সি থেকে নেমে দেখি, মাত্র ষোলো পয়সার জের টানছি। মদ্‌নার জন্যেই তো ট্যাক্সি চেপে আসতে হ'ল—শেষ পর্যন্ত গণ্ডারের বাচ্চাই আমায় ফতুর ক'রে দেবে মামা।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল দুলাল।

কিন্তু তার আগেই রাঘবেন্দ্র বসু-রায় দাই ডাকতে ছুটলেন। সারাটা পথ তিনি নন্তর মায়ের কথা ভাবলেন না। ভাবলেন শুধু ভাগ্নের কথা। আন্দামানে এতোদিন বাস করলে কি হবে, কলকাতার ছেলেদের চেয়েও বেশি চালাক। দুনিয়াব লোক সকালে উঠে বাথরুমে যায়, আর এই ছোকরা বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জে বিজয় মান্নার বাড়ি চলল বাথরুম ব্যবহার করতে! চালাকি আর কাকে বলে? অল্প বয়সে পিস্তল ছুঁড়েছে, বুদ্ধি রাখে মাথায়। বাইরে থেকে দুলালকে হাবাগবা মনে হয় বটে, কিন্তু দরকার পড়লে গোটা বাগবাজারকে সে কাবলীওয়ালাদের কাছে বাঁধা রেখে আসতে পারে। মুজাফ্‌ফর খাঁ আজ আসবে সুদ চাইতে। ঝপ্ ক'রে গতকাল এক পোয়া মটন কেনা তাঁর উচিত হয়নি। মটন কিনতে গিয়ে পেঁয়াজও কিনতে হ'ল। পেঁয়াজ ছাড়া স্বয়ং সম্রাট আকবরের বাবুর্চিও দো-পেঁয়াজী রান্না কবতে পারত না।

দাইকে সঙ্গে নিয়ে ফেরার পথেও শুধু দুলালের সমস্যার মধ্যেই ডুবে রইলেন তিনি। ব্ল্যাকের কথাটা তাঁর বলা উচিত হয়নি। গুলী যখন ছুঁড়তে পেরেছিল তখন ভেতরে ভেতবে সাধু হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া, আন্দামানের কাঁচা জঙ্গলে ব্ল্যাকের স্বাদ পাওয়ার সুযোগও পায়নি দুলাল।

ট্যাক্সি থেকে দাইকে নামিয়ে দিয়ে রাঘববাবু বললেন, "তুমি ছুটে যাও, আমি আসছি।"

একটু দূরেই মুজাফ্‌ফর খাঁ লাঠির ওপর থুতনি ঠেকিয়ে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল দোতলার দিকে। তাঁর শোবার ঘরটা পর্যন্ত কাবলীওয়ালাটা চেনে। পাঁচ টাকা বারো আনা স্থদ দিতে হবে। বারো আনাটা আর দিতে পারলেন না। তিনি বললেন, "মেরা ঔরৎকা বাচ্চা হোগা, ভা-রি ব্যস্ত আছি।"

দোতলায় উঠে এসে সন্তকে সামনে দেখতে পেলেন। সন্ত ব'লে উঠল, "বাবা, এবার বোন হয়েছে। কী মজা!"

"তোর ছুলালদা কই রে?"

"এই তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। দুপুরে এসে ভাত খাবেন বললেন। এখন সেই হাফ-পাউণ্ড রুটিটা খেয়ে গেলেন। বাবা, পয়সা দাও, রুটি আনব। আমরা কেউ এখনো খাইনি।"

রাঘবেন্দ্র বস্থ-রায় সন্তুর দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলেন।

ছয়

কলকাতা পরিদর্শন করতে হবে, বাসে কিংবা ট্রামে উঠল না ছুলাল। হাঁটতে লাগল এস্‌প্লানেডের দিকে। বেলা দশটার মধ্যে কফি-হাউসের দরজায় গিয়ে পৌঁছনো চাই। যতোদূর মনে পড়ে, বেলা দশটার সময় কমলদা কফি-হাউসে কফি খেতে আসতেন। ভা-রি আমুদে মানুষ। ছোটগল্প লেখবার হাত এবং প্রতিভা ছিল। হয়তো এতোদিনে তিনি বাংলা-সাহিত্য-সাম্রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রী হ'য়ে বসেছেন।

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু ধ'রে দক্ষিণ দিকে হেঁটে চলেছে ছুলাল। দু'দিকের উচু-উচু বাড়িগুলো আরও বেশি উঁচু হয়েছে ব'লে মনে হ'ল ওর। তলা বেড়েছে। বাড়বেই তো। রাঘবমামা বললেন, উনত্রিশ সাল থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত সিমেণ্ট আর লোহার ওপর কণ্ট্রোল চলেছে। কী 'হাউস' ওটা? ধুতুরিয়া হাউস। এটা তো

শুধু পাঁচতলা ছিল আটত্রিশ সালে! দুলালের মনে পড়ল, এই হাউসটার তলায় দাঁড়িয়ে একদিন সে আখের রস খেয়েছিল। ভরা দুপুর। গ্রীষ্মকাল। একজন হিন্দুস্থানী মেশিনের চাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আখ নিঙড়ে রস বার করছিল। দু'আনায় দু'খুরি রস। দুলালের প্রথমে তেষ্টা পায়নি। একপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বিপ্লবী ঘনশ্যামের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। ঘনশ্যামের হুলিয়া বেরিয়েছে। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। তখনকার দিনে মারোয়াড়ীদের বাড়ির ওপর পুলিশরা নজর রাখত না। তাই সাক্ষাতের ভারি সুবিধে হ'ত এই অঞ্চলে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল দুলাল। ঘনশ্যামের আসবার সময় ছিল পৌনে দুটোয়। এখন দুটো বাজল। হয়তো সে মারোয়াড়ীদের মতো পোশাক প'রে আসবে। ধুতুরিয়া হাউসের চতুর্দিকেই চোখ রেখেছে, কিন্তু একটি মারোয়াড়ীও তার চোখে পড়ল না। ভরা দুপুর। পীচের রাস্তা থেকে বাষ্প বেরুচ্ছে। এই সময়ে পুরুষ মারোয়াড়ীরা সবাই ব্যবসা করতে যায়। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-ন'টা বাজে। ধুতুরিয়া হাউসের সামনের দরজাটা কাঠের নয়, লোহার। কলাপ্-সিবল্ গেট। একটু আগেও দুলাল দেখেছে গেটের গায়ে দুটো হাতী-মার্কা তালা ঝুলছে। এখন দেখল তালা নেই, গেট খোলার আওয়াজ পেল সে। ঘনশ্যাম কি ধুতুরিয়া হাউসের ভেতর থেকে বেরুবে? দেখবার জন্য সামনে এগিয়ে আসতে হ'ল। বিনা কারণে এগিয়ে আসাও মুশকিল। এক আনার আখের রসের অর্ডার দিল দুলাল। পেছন ফিরে দেখল, কলাপ্সিবল্ গেটের ওপাশে গুটিপাঁচেক মারোয়াড়ীর বউ ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ক'রে কাঁসার গেলাস। প্রথমে দুলালের মনে হয়েছিল গেলাসগুলো সব সোনার। জীবনে যারা সোনা দেখেনি তাদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দুলালের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। সৌভাগ্যবশত, হঠাৎ একদিন মায়ের হাতে দু'গাছা সোনার চুড়ি

দেখে ফেলেছিল সে। বিয়ে-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিলেন ব'লে বাক্স থেকে সরু সরু চুড়ি দু'গাছা বার করেছিলেন তিনি। এখন তো অনেক দিনের কথা। মা-ও নেই, সোনার চুড়িও বোধ হয় গ'লে-ট'লে গড়িয়ে-টড়িয়ে বড়বাজারের দিকেই চ'লে এসেছে। ঝনঝন আওয়াজ হ'ল। দুলাল দেখল, গেলাসগুলো এগিয়ে ধরবার সময় মারোয়াড়ী-বউদের হাতগুলো কলাপ্‌সিবল্‌ গেটের লোহার সঙ্গে ধাক্কা লেগে গিয়েছে। তাদের হাতভর্তি সোনার চুড়ি। পাকা লোহার সঙ্গে পাকা সোনার যদি দৈবাৎ ঠোকাঠুকি লেগে যায় তাহ'লে তার আওয়াজটা যে ঠিক কী ধরনের হবে দুলাল তা আজও ব'লে দিতে পারে। আহা, সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি আজও ওর কানের পর্দায় লেগে রয়েছে। খাঁটি ক্লাসিকেল! যাই হোক, প্রত্যেকটি গেলাস ভ'রে দিতে হ'ল হিন্দুস্থানী রসওয়ালাকে। ভরতে বেশ সময় লাগল লোকটির। পুরো দু' পাইণ্ট ঢালবার পরেও গেলাসগুলো কানায় কানায় ভর্তি হ'ল না। দুলাল তার মাটির খুরিটা হাতে নিয়ে বেলা দুটো থেকে অপেক্ষা করছে। এবার ওর সত্যি সত্যি তেষ্টা পেল। ছাতি ফাটবার উপক্রম! রসওয়ালা বোধ হয় দুলালের ছাতির ভেতরটা দেখতে পেয়েছিল। মারোয়াড়ীর বউরা যখন ঘোমটার তলায় গেলাসগুলি ঢুকিয়ে রস পান করছিলেন সেই অবসরে এক আনার খুরিটা ভর্তি ক'রে দিল সে। তারপর মিনিট পাঁচেকের ইনটারভেল। প্যাকাটির মতো জীর্ণশীর্ণ একটা দারওয়ান গেলাসগুলো নিয়ে গেল ধুয়ে আনবার জন্যে। হিন্দুস্থানীটা মেশিনের চাকাটা এক মিনিটের জন্যও থামিয়ে দেয়নি। শুধু ঘুরিয়েই যাচ্ছে। আবার দু' পাইণ্ট ক'রে মোট দশ পাইণ্টের স্টক তৈরি করতে হবে। দারওয়ানটা ফিরে আসবার আগে আরও এক আনার রস কিনে ফেলল দুলাল। ঠিক আড়াইটার সময় ঘনশ্যাম এল রিক্‌শায় চেপে। তারপর দশ বছর পার হয়ে গিয়েছে।

সেই ধুতুরিয়া হাউসের উচ্চতা বেড়েছে। মামার কথাই ঠিক। সিমেণ্ট আর লোহার ওপর কণ্ট্রোল যতোদিন থাকবে ততোদিন বাড়িঘর উঁচুও হবে, আবার সংখ্যায়ও বাড়বে। কণ্ট্রোল তুলে দিলেই রাজমিস্ত্রীদের মধ্যে অনেকেই বেকার হ'য়ে যাবে। বড় সুন্দর অর্থনীতি! পিওর ইকনমিক্স! অর্থনীতিজ্ঞ কীন্স সাহেবের এবং তৎপুরুষের পূর্বসূরীদের খুরে কোটি কোটি প্রণাম!

হ্যারিসন রোডের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল দুলাল। এ-অঞ্চলে আর কিছু দেখবার নেই। 'বঙ্গ আমার জননী আমার'—তিনি কোথায়? কমলদাকে গিয়ে ধরতে না পারলে বঙ্গদেশকে কিছুতেই খুঁজে বার করা যাবে না। ধরা পড়বার আগের দিনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তিনি গদ্যে আবোল-তাবোল লিখছিলেন। কবিতা লিখতে পারতেন না কমলদা। অথচ কবিতা ভালবাসতেন খুব। আবোল-তাবোল বইখানা তাঁর আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। সন্ধের পর বারোদুয়ারীতে ঢুকেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন: বল্ তো, কচু আলু আর আদা একসঙ্গে মিশে গেলে কি হয়? বড় আমুদে মানুষ। সব সময়েই হাসিখুশি ভাব। এতোদিনে নিশ্চয়ই তাঁর গদ্যে আবোল-তাবোল লেখা শেষ হ'য়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকেও ভালবাসতেন খুব। একবার কবিগুরুর খুব অসুখ হয়েছিল। দুলাল জিজ্ঞাসা করেছিল, "কি হবে কমলদা? ভগবান না করুন, তিনি যদি ম'রে যান?" ক্ষুদিরামের জীবনী পাঠ করতে করতে ঘনশ্যাম বলেছিল, "ভয় কি রে, শূন্য সিংহাসনটা পাহারা দেবে বিশ্বভারতী।" কমলদা বলেছিলেন, "পাহারার জন্য কাউকে না রাখাই ভালো হবে রে।" "কেন? কেন?" প্রশ্ন করেছিল দুলাল। পর পর দু'খিলি পান মুখে ভ'রে দিলেন কমলদা। দু'খিলি পান একসঙ্গে খেলেই বুঝতে হবে, কমলদা ভেতরে ভেতরে ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে উঠছেন। অন্তর্চক্ষু বুঁজিয়ে ফেললেন। ধ্যানে বসছেন কমলদা। একটু বাদেই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, "পাহারাওয়ালাদের মধ্যে

লাঠালাঠি লেগে যেতে পারে। পাহারার দরকার নেই, চাঁদা তোলবারই বা দবকার কি ? শেক্সপীয়ার কিংবা গ্যেটেকে বাঁচিয়ে বাখবার জন্য ওঁরা কি শেক্সপীয়ার অথবা গ্যেটে ইউনিভারসিটি খুলেছেন ? খোলেননি। তা ছাড়া, শান্তিনিকেতন তো একটা আশ্রম। গ্র্যাজুয়েট উৎপাদনের কারখানা নয়। আশ্রম কথাটা আধুনিক, না প্রাচীন ? শোন্ দুলু, বাল্মীকির আশ্রমটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যদি পাহারাওয়ালাদের ডাকবার দরকার না হ'য়ে থাকে তা হ'লে রবীন্দ্র-আশ্রমকে বাঁচাবার জন্য কাউকে ডাকতে হবে না। বাল্মীকির মতো তিনিও ভারতবর্ষেব মনোরাজ্যে বেঁচে থাকবেন। চাঁদা তুলে কেউ কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।"

সে আজ কতোদিন আগেকার কথা! গণেশ অ্যাভিনূর মোড়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল দুলাল। কফি-হাউস এখান থেকে আর পাঁচ মিনিটের পথ।

পথ অতিক্রম করেছিল দুলাল। কফি-হাউসে প্রায় বাবোটা পর্যন্ত ব'সেও ছিল। কিন্তু কমলদার দেখা পেল না। তাঁর খবরও কেউ দিতে পাবল না। পুরনো মুখ একটিও চোখে পড়ল না ওর। সব বদলে গিয়েছে। এমন কি, দেয়ালচিত্রগুলিও আর আগের মতো নেই। ঢং এবং বিষয়বস্তুব মধ্যে বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করল সে। স্ত্রীলোকের দেহে আর রহস্য কিছু নেই। এক পেয়ালা কফি শেষ হওয়ার অনেক আগেই সব-কিছু দেখা শেষ হ'য়ে যায়।

চীনা রেস্তোরাঁটার পাশ দিয়ে আবার বাগবাজারের দিকেই ফিরে চলল দুলাল। দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেই অন্ধ লোকটি গীটার বাজাচ্ছে। লোকটিকে দুলাল চেনে। আটত্রিশ সালেও এইখানে রেস্তোরাঁর দরজায় ব'সে গীটার বাজাত। গীটারটাও পুরনো। দশ বছরের রোজগার থেকে একটা নতুন যন্ত্র কিনতে পারেনি। দুলালের সঙ্গে পরিচয় ছিল এর। গৎটা শেষ হওয়ার পর দুলাল নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হ্যালো

স্ট্যানফোর্ড, কেমন আছ? বুড়ো হ'য়ে গিয়েছ দেখছি? মেয়ে কেমন আছে? সেও তো বড় হয়েছে।—কী যেন ওর নামটা?"

"ন্যান্‌সি।"

"হ্যাঁ, ন্যান্‌সি। সে কোথায়?"

"বিয়ে-শাদি করল না। জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাস করার পর চার্চে ঢুকে গেল।"

"চার্চে ঢুকে গেল মানে কি, স্ট্যানফোর্ড?"

"নান্‌ হ'য়ে গেল, মানে—সংসারে আর ফিরে আসবে না।"

"ও—বুঝেছি, সন্ন্যাসিনী। মানে, হ্যাঁ, বুঝেছি। আমরা এঁদের ব্রতচারিণী বলি। তা হ'লে তোমায় দেখাশোনা করে কে?"

জবাব দিল না স্ট্যানফোর্ড। অন্ধ চোখ-দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরল শুধু। তারপর নতুন গৎ বাজাতে শুরু করল সে। দুলাল আর অপেক্ষা করল না। অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছে। বাগবাজার পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে। ট্রামে কিংবা বাসে উঠে শুধু শুধু পয়সা নষ্ট ক'রে লাভ কি। এখনো তো রোজগারপত্র কিছু নেই। কি মনে ক'রে ট্যাঁক থেকে কাগজে মোড়া পার্সটা বার করল সে। খামের মধ্যে টাকা রাখে দুলাল। দু'খানা এক টাকাব নোট বার ক'রে স্ট্যানফোর্ডের হাতের মুঠোতে গুঁজে দিল। গৎ-বাজানো বন্ধ ক'রে দিল স্ট্যানফোর্ড। আবার সেই অন্ধ চোখ দুটি তুলে ধরল আকাশের দিকে। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে যখন সে ভেজা চোখ দুটো মুছতে যাবে, দুলাল তখন চীনা-রেস্তোরাঁর দরজা থেকে অনেকটা দূরে চ'লে এসেছে।

আজ শনিবার। সকাল থেকেই রাঘবমামার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। কলকাতা ফুটবল গ্রাউণ্ডে মোহনবাগান খেলতে যাবে। খেলা হবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে। চ্যারিটি ম্যাচ। রাঘবমামা মোহনবাগান ক্লাবের মেম্বার। টিকিট তাঁর পকেটে

রয়েছে। তিনি এক সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে ব'সে আছেন। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গতকাল আড্ডায় গিয়ে দশ টাকার জুয়া খেলে এসেছেন। মোহনবাগান যদি এক গোলে হেরে যায় তা হ'লে মামাবাবু চল্লিশ টাকা জিতবেন। যদি না হারে তা হ'লে দশটা টাকাই গেল!

সকালবেলা তুলালের ঘরে এলেন তিনি। বিছানার পাশে ছাড়া অন্য কোথাও বসবার জায়গা নেই। বাঁ দিকের জানুর ওপরে ডান পা-টা টেনে তুলে রাখলেন। তারপর ডান পায়ের আঙুলগুলো দোলাতে দোলাতে বলতে লাগলেন, "বুঝলি তুলু, স্পেকুলেশনের পেছনে অনেক হিসেব আছে। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। সারা দিনই পড়বে—"

বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল তুলাল। সে বলল, "এখানে দেখছি হাওয়া-অফিস বলছে, বিকেলে পরিষ্কার আকাশ।"

"সেইজন্যই তো নিঃসন্দেহ হলুম, বিকেলে বৃষ্টি হবেই। ভেজা মাঠে মোহনবাগানের যে-প্লেয়ার তুজন ভালো খেলে তারা আজ খেলবে না। আরও সিক্রেট খবর আছে, শোন্। মারামারির ভয়ে ওদের ছেলেরা সহজে জিততে চায় না—ড্র রাখতে পারলেই খুশি হয়। মোহনবাগান বড় সাংঘাতিক ক্লাব! শোন্ তুলু, কাগজ রাখ্। স্পোর্টিংএর ছেলেরা আজ নির্ভয়ে খেলবে। পুলিশ ওদের আগুতেই খবর পাঠিয়েছে যে, আজ সত্যি সত্যি এরা খুব কড়া পাহারা দেবে। অতএব—তুলু, তোর মামীমা বলছিলেন, তুই খুব লাকি। পরশু এলি, আর কালকেই মেয়ে হ'ল। বসু-রায়ের পরিবারে এই প্রথম কন্যা। তুলু, গোটা-পাঁচেক টাকা লাগিয়ে রাখ্! দে, পাঁচটা টাকা বার কর্। তুই বরং এক কাজ কর্—ইভ্ন্ মনিতে লাগিয়ে রাখ্। খেলা ড্র হবে। আমার মতো রিস্ক্ নেয়ার তোর দরকার নেই। দে, পাঁচটা টাকা দে, তুলু। বেলা বাড়লে কেউ আর ইভ্ন্ মনিও দিতে চাইবে না।"

"টাকা আমার নেই, মামা। এই তো সবে আন্দামান থেকে ফিরলুম। কাঁচা জঙ্গলের গন্ধ এখনো শুকয়নি।"

"সন্তু বলেছে তুই টাকা রাখিস ট্যাঁকে। দে মাইরি—সন্ধের আগেই ক'টা টাকা তোর রোজগার হ'য়ে যাবে।"

"আমার রোজগার যদি হয়, তা হ'লে তোমার তো পুরো লোকসান, মামা। তোমার এই জুয়াখেলার কায়দাটা কিছু বুঝলুম না। সব দিকেই কিছু কিছু লাগিয়ে রাখছ বুঝি?"

দৌড়তে দৌড়তে সন্তু এসে ঘরে ঢুকল, "সব্বোনাশ হয়েছে! শিগ্‌গীর এসো, বাবা। ঠাক্‌মা হাতে ব্যথা পেয়েছে।" হাঁপাচ্ছে সন্তু।

মামা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, হ'ল কি? টেব্‌লের ওপরে মলম আছে, লাগিয়ে দিগে যা। ছুলু, খুচরো না থাকলে নোট বার কর্, সন্তু ভাঙিয়ে দেবে।"

"তুমি এসো, দেখবে এসো, বাবা। ঠাক্‌মার তুলসীগাছ খেয়ে ফেলেছে মদন! তিনটে টবের একটা গাছও নেই।"

ছুলাল উঠে পড়ল তড়াক ক'রে। রাঘববাবুও উঠলেন। ছাদে পৌছতে ছু' মিনিটও লাগল না।

সন্তু এলো একটু পরে। মলমের কৌটোটা নিয়ে এসেছে সে।

বৃদ্ধা ডান হাতের কব্‌জি ধ'রে ছাদের ওপরে ব'সে পড়েছেন। ছুলাল গিয়ে হাতটা তাঁর চেপে ধ'রে জিজ্ঞাসা করল, "হাতে লাগল কি ক'রে, দিদিমা?"

"ঝ্যাঁটা মারতে গিয়ে। ঐ ছ্যাখ্, তোর মদ্‌নার কাণ্ড ছ্যাখ্। ঝ্যাঁটা চিবচ্ছে!"

"তুই বড্ড আন্‌-লাকি, ছুলাল," রাঘবমামা মলমের কৌটো খুললেন, "এই বাজারে এই রকমের একটা ঝ্যাঁটা বারো আনার কমে পাওয়া যায় না। বারুইপুরের স্পেশাল এগুলো—হাঁ ক'রে দেখছিস কি, সন্তা?"

"কি করব ?"

"সবটা তো এখনো খায়নি, বাকীটুকু মুখ থেকে ওর টেনে বার ক'রে নে। এই বয়সেই এক পো চালের ভাত খাচ্ছিস, গায়ে জোর নেই ? কী ভীষণ লোকসান! আটচল্লিশ সালের মাত্র মাঝামাঝি, এর মধ্যেই ছ'আনার বেশী খেয়ে ফেললে! হজম করতে পারবে তো, তুলাল ?"

"পারবে কি বলছ মামা, এতোক্ষণে পেটে আর ওর কিছুই নেই।"

"বলিস কি ? চামড়ার চেয়ে ওর লীভার দেখছি বেশি শক্ত। তাও তো বলিস মাত্র এক বছর বয়স ওর।" মায়ের হাতে মলম ঘ'ষে দিলেন রাঘববাবু। সন্তুর ঘাড়ে হাত রেখে বৃদ্ধা হাঁটতে লাগলেন সিঁড়ির দিকে।

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে গভীর দৃষ্টিতে তুলাল চেয়ে ছিল মদনের দিকে। মিনিট তু-তিন অন্য কোনো দিকে আর চোখ ফেরালো না। রাঘববাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এতো তন্ময় হ'য়ে দেখছিস কি ?"

"দেখছি না, অনুভব করবার চেষ্টা করছি। মামা, মদনের মধ্যে আমি নতুন সত্যের সন্ধান পেলুম। এতোদিন আমি ভেবেছি, গণ্ডারটা আমার মতো শুধু ঐতিহাসিক জড়বাদে বিশ্বাসী। এখন আমার ভুল ভেঙে গেল। আমি দেখতেই ভুল করেছি।"

"দেখলিটা কি ?"

"এ শুধু যেমন-তেমন ভাবে দেখা নয়, সমস্ত হৃদয় মন এবং অস্তিত্ব দিয়ে দেখা!"

তুলাল মদনের গা ঘেঁষে গিয়ে বসল। একটু যেন কেমন ভড়কে গেলেন রাঘববাবু। পাঁচটা টাকা না দেওয়ার জন্য ভান করছে না তো ছোকরা ? ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তিনি তুলালের মুখ দেখবার চেষ্টা করলেন। চোখ বন্ধ ক'রে তুলাল যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে গেছে। নাঃ, ভান কিংবা ভড়ং ব'লে তো মনে হচ্ছে না! মিনিট-পাঁচেক পর

রাঘববাবু নিজেই চমকে উঠলেন। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজল। দাড়ি কামানো হয়নি। চান করতে হবে। খেয়েদেয়ে ঘণ্টা-দুই ঘুমতে হবে। এই রে, আবার তো বাজারে যেতে হবে একবার! ছাতাব গোটা-চার শিক আগের দিন মাঠেই ভেঙে গিয়েছিল। সেগুলোকে বদলে না নিলে আজ তিনি মাঠে যাবেন কি ক'রে? নাঃ, সব দিকেই গণ্ডগোল বেঁধে গেল। সাড়ে তিনটের মধ্যে মাঠে গিয়ে পৌঁছতে হবে। দুলালেব গায়ে ধাক্কা মারলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপারটা কি?"

"গভীর ধর্মবোধ জন্মেছে মদনের।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তা তো জন্মাবেই। তিনটে তুলসীগাছ চিবিয়েছে তো! আদ্দেক ঝাঁটা হজম করেছে বটে—"

বাধা দিয়ে দুলাল বলল, "পুরোটাও পারত।"

"তা কি আর জানি না রে ছোড়া! মামাবাড়ির সম্পত্তি যতো নষ্ট হয় ততোই ভালো। দেখিস, ব'লে রাখলুম, তুলসীপাতা হজম করতে পারবে না, তোর গণ্ডারের বাচ্চা। এ বাবা তারকেশ্বরের পা ছুঁইয়ে এনেছেন মা। লীভাব ওর যতো শক্তই হোক, দেখিস, পাতাগুলো তালগোল পাকিয়ে পেটের মধ্যে কিরকম উদ্বেগের সৃষ্টি করে। দশ বছর পরেও হজম করতে পারবে না। দেখিস, হোমিওপ্যাথির গ্লোবিউলের মতো পেটের মধ্যে ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। লীভার ওর গলিত লাভার মতো গ'লে গ'লে বেরিয়ে আসবে। চামড়া নিয়ে গর্ব করিস, সেও দেখিস শুকিয়ে শুকিয়ে ব্যাঙের ছাতার মতো সাদা আর ছোট হ'য়ে গেছে। দেখিস, শঙ্খচূড় সাপের মতো গায়ে সব দাগ পড়েছে— আসলে ওগুলো কীর্তির চিহ্ন নয়, সব ফান্‌গাস, ছাত্‌লা।"

"দেখতে পারব কি, মামা?"

"কেন?"

"এতোদিন বোধ হয় বাঁচব না আমি। মদনের আয়ু খুব লম্বা।"

"কলকাতায় তো ত্যাঁদোড়ের অভাব নেই, কিন্তু তোর মতো তুখোড়—মানে, পাঁচ টাকার জন্য— "

লাফাতে লাফাতে সন্তু আবার এসে উপস্থিত হ'ল। চোখে-মুখে ওর আনন্দের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। দুলালের ঘাড়ে হাত রেখে সন্তু ঘোষণা করল, "বাবা, দেখবে চলো বাজার থেকে পাঁচীর মা সিঁদুর-মাখানো পোনা মাছ এনেছে। গোটা মাছ গো। পাঁচীর মা বললে, পুব্ববঙ্গের জল না খেলে মাছের এমন রং হয় না।"

"বটে! পয়সা পেল কোথায়? দুলুদাকে খাওয়াবার জন্য তোর মা বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা দিয়েছে? মহোচ্ছব? দুলাল, আর কতোদিন মামাবাড়িতে থাকবি রে? আটচল্লিশ ঘণ্টা তো হ'তে চলল।"

বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ল্যাণ্ডলর্ড-পিতাব দিকে চেয়ে রইল সন্তু। তারপর উদ্দীপ্ত সুবে সে বলল, "পাঁচীর মাকে পাঁচ টাকার নোট দিয়েছে দুলালদা।"

কথাটা সবাই শুনল বটে, কিন্তু মদন শুনতে পেলে না। সে এর মধ্যেই লক্ষছিদ্রযুক্ত খোলা ছাদের ওপব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে।

এমন নিশ্চিন্ত-নিদ্রা শুধু গণ্ডারের পক্ষেই সম্ভব, ভাবল দুলাল।

আজ শনিবার। আটচল্লিশ ঘণ্টা পুরো না হ'তেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য এসে গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পর বাথরুমে মুখ ধুতে গিয়ে দুলাল সবিস্ময়ে স্নানঘরের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগল। কাল তো আয়নাটা চোখে পড়েনি! আয়নাটা মামাবাড়ির সম্পত্তি, কিন্তু মুখটা কার? আটচল্লিশ ঘণ্টাও হয়নি, এর মধ্যেই মুখের রেখাগুলো সব কেঁচোর মতো কুঁচকে গিয়েছে। আটাশ বছরের যুবক আশী বছরে পা দিল যেন। কলকাতার জলবায়ু আর আগের মতো নেই। এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে গজুদার কাছে

পৌঁছনো দরকার। তাঁর বোধ হয় বৃহস্পতিবার রাত্রিতেই সব-কিছু দেখা হ'য়ে গেছে। শুক্রবারটা ফাউ। হয়তো গতকালই তিনি গঙ্গার ধারে এসে অপেক্ষা করছেন দুলালের জন্য। দুলালের যদি আশী বছরের বার্ধক্য এসে গিয়ে থাকে তা হ'লে গজুদা নিশ্চয়ই একশো আশী বছরের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছেন। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই। মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়াই ভালো।

খাওয়া-দাওয়ার পর মামা গিয়ে শুয়ে পড়লেন। দুপুরবেলা ঘুমনোর অভ্যাস দুলালের নেই। মামা বলেছেন, ঠিক তিনটের সময় ট্রাম ধরবেন তিনি। এখন মাত্র দেড়টা। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখল দুলাল, আকাশে মেঘ রয়েছে খুব। সারাটা দিনই বৃষ্টি হবে। গঙ্গার ধারে বসবার জন্য মাঠ রয়েছে বটে, কিন্তু মাথা এবং গা ঢাকবে কি দিয়ে? গজুদার তো শুধু গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগ সম্বল। ব্যাগের বদলে তাঁর যদি একটা ছাতা থাকত?

এখন একটা ছাতার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হ'য়ে পড়ল দুলাল। কলকাতায় বাস করতে হ'লে যে ছাতার দরকার হ'তে পারে তেমন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার আজকেই শুধু বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে হচ্ছে ওর। আটাশ বছর তো চলছে, কই কোনোদিনই তো ছাতা মাথায় দেয়নি সে? এখন আর টিপ টিপ নয়, বেশ জোরে-জোরেই বৃষ্টি পড়তে লাগল। মামার ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হ'ল দুলাল।

বাজারে গিয়ে ছাতার শিক বদলে নিয়ে এসেছেন তিনি। যারা খেলা দেখতে যাবে তারা হয়তো ছাতা মাথায় দিয়ে খেলা দেখবে এবং উপভোগও করবে। কিন্তু মামা তো খেলা উপভোগ করেন না, তিনি যান ফলাফল দেখতে। তাঁর আবার ছাতার দরকার হয় কেন? ক্লাবঘরের মধ্যে ঢুকে ব'সে থাকলেই তো পারেন। মোহন-বাগান হারল কি জিতল সেই খবরটা জানবার জন্য কেউ ছাতা

নিয়ে মাঠে যায় নাকি? আরে, রামো রামো, তা কি কখনো সম্ভব! মামার ঘরে উঁকি দিল দুলাল। তারপর ঢুকেই পড়ল ঘরে।

চকিতের মধ্যে ঘরের চারদিকটা দেখে নিল সে। ছাতাটা চোখে পড়ল না ওর। সিন্দুক-ফিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখেননি তো? টাকা-পয়সা কিছু রেখে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু দাদামশাই মস্ত বড় একটা সিন্দুক কিনেছিলেন। উত্তরাধিকারসূত্রে মামা সেটা পেয়েছেন। ঘরের এককোনায় সিন্দুকটা দেখতে পেল দুলাল। পা টিপে টিপে সিন্দুকের কাছে গেল। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখল, সিন্দুকটা খোলাই রয়েছে। দরজাটা টেনে পুরোপুরি খুলে ফেলল। না, ছাতাটা ওখানে নেই। নতুন নতুন কাঁথা সেলাই ক'রে রেখেছেন মামীমা। সিন্দুকের দরজাটা ঠেলা দিয়ে ভেজিয়ে দিল সে।

ঘুমের মধ্যেও মামার চালাকির আর অন্ত নেই! ছাতাটাকে পাশবালিশের মতো পেঁচিয়ে ধ'রে ঘুমচ্ছেন। সত্যি সত্যি ঘুমচ্ছেন তো? পরীক্ষা করবার জন্য ছাতাটা ধরতে গেল দুলাল, বাইরে থেকে সন্তু চাপা সুরে ব'লে উঠল, "সব্বোনাশ!"

তড়াক ক'রে লাফ মেরে বাইরে বেরিয়ে এসে দুলাল বলল, "কি হ'ল—দেখছিলুম মামা সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন কিনা।"

"দুলুদা, বাবার ছাতাটা ধরতে যাচ্ছিলে তুমি। আমি দেখেছি—"

রাঘববাবু এপাশ ফিরে বললেন, "আমিও দেখেছি। সন্তু, ক'টা বেজেছে একবার দেখে আয় তো। ভাড়াটেদের ঘড়ি বড্ড স্লো যায়, ঠাকুরের দোকানে যা। দুলাল, শোন্—"

ঘরে ঢুকল দুলাল।

রাঘববাবু বললেন, "দিনটা আজ কেমন যাবে, বলা মুশকিল। দুর্ভাবনায় ঘুম এল না। শনিবার, আজ একটা ইম্‌পরটেণ্ট খেলা

—এমন দিনে বসু-রায়দের বাড়িতে একটিও তুলসীগাছ নেই! বব্বাবে খেলে কি হ'ত? গতকালও তো খেতে পারত। তোর মদন বোধ হয় এখনো পুরোপুরি পোষ মানেনি। তোর কি মনে হয়?"

"মোহনবাগান হারবে।"

"ব্যাস্, তা হ'লেই হ'ল। এই তো ভাগ্নের মতো কথা। তোকে একটা ছাতা আমি দেবো। দু'একটা তালি লাগানো বটে, তা তোর কাজ চ'লে যাবে। তুই তো আর অমন একটা ইম্পবটেণ্ট খেলা দেখবিনে। সন্তু আসুক, ছাতাটা আনিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি ভালোই আছে।"

"কোথা থেকে আনাবে?"

"চিলেকোঠা থেকে। এখন তো আর ছাতাপটিতে যাওয়ার সময় নেই—নইলে ফুটোফাটা যা দু'চারটে আছে বুঁজিয়ে আনা যেত। যৌবন বয়সে বাবা বাগনান যেতেন ছাতা মাথায় দিয়ে। তোদেব দেশেব স্মৃতি-মাখানো ছাতা রে—"

সন্তু এসে গেল। খবর দিল, "ঠিক আড়াইটে বেজেছে, বাবা।"

"আড়াইটে? তা হ'লে তো আর সময় নেই। বাথরুমে যাচ্ছি, দুলাল। সন্তু, চিলেকোঠা থেকে তোর দাদুব ছাতাটা নিয়ে আয়। এনে তোর দুলুদাকে দে।"

সন্তু একটু পবেই ছাতা নিয়ে ফিবে এল। দুলাল দেখল, নারকোলের দড়ি দিয়ে ছাতাটা বেঁধে বেখেছেন রাঘবমামা। দেখতে অনেকটা মদনের বক্লসের মতো। দুলালের হাতে ছাতাটা আলগোছে তুলে দিয়ে সন্তু গেল ঠাকুরের দোকানে পান আনতে। খেলাব মাঠে পান কেনেন না রাঘবমামা। জগন্নাথ ঠাকুরের পান তিনি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। খেলার মাঠে নগদ দিয়ে পান কিনতে হয়। জগন্নাথ ঠাকুর বাকীতে দেয়। বাগবাজারের পুরনো বংশ বসু-রায়রা। মোটা টাকা বাকী পড়া

সত্ত্বেও জগন্নাথ ঠাকুর আজও হাসিমুখে রাঘবমামার সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বসু-রায়দের বিপদে আপদে নগদ দিয়েও বারকয়েক সাহায্য করেছে সে।

ছাতাটা কোলে নিয়ে ব'সে ছিল হুলাল। বাগনানের স্মৃতি-বিজড়িত ছাতা। খুলতে গেলেই হয়তো পুরনো আস্তরের মতো ঝুর ঝুর ক'বে লোহার শিকগুলো সব ঝ'রে পড়বে। মামা বলবেন, হুলালের হাতে গিয়েই ছাতাটা এতো তাড়াতাড়ি নষ্ট হ'য়ে গেল। মেরামতের জন্য টাকাকড়ি চাইতে পারেন। তার চেয়ে বরং মামা বাথরুম থেকে ফিরে আসুন। তিনি নিজ হাতে বক্‌লসটা খুলুন। ভেতরের রহস্য না জেনে হুলাল এতোবড় একটা ঝুঁকি নিতে চাইল না। হয়তো বিপদে ফেলবার উদ্দেশ্যেই তিনি ছাতাটা নিয়ে আসতে ব'লে বাথরুমে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। আব মিনিট পাঁচেকের মধ্যে তাঁকে বেরুতেই হবে। তিনটেতে ট্রামে চাপবেন। খোলা দরজার দিকে চেয়ে মামার আগমন-প্রতীক্ষায় ব'সে রইল হুলাল। ছাতাটার দিকে দৃষ্টি দিতেও ভয় করছিল ওর। কোলে নিয়ে বসেছে তাতেই মনে হচ্ছে, একটু চাপ লাগলেই বুঝি পেঁজা তুলোর মতো কাপড়টা খুলে খুলে পড়বে।

ঘরে ঢুকলেন রাঘবমামা। বাইরে থেকেই বলতে বলতে এলেন, "বুঝলি হুলু, বাবা খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন—" সিন্দুকের ওপরে খবরের কাগজের একটা মোড়ক ছিল। কাগজটা খুলে ফেললেন মামা। তার আগে গায়ের গেঞ্জিটা খুলতে হ'ল। গেরুয়া রঙের গেঞ্জি মনে হয়। বোধ হয় কেনার দিন থেকে গেঞ্জিটা পরছেন। জল লাগেনি সুতোর গায়ে। সাবান তো নয়ই। মোড়কের মধ্যে এক সেট পোশাক আলাদা ক'রে রেখে দেন মামা। সুন্দর একটা দামী গেঞ্জি গায়ে পরলেন। তারপর কালো পাড়ের তাঁতের ধুতিটা হাতে তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, "বুঝলি হুলু, বড্ড বেশি শৌখিন ছিলেন বাবা। একই জিনিস জীবনে হু'বার কেনেননি। কুড়ি বছর

বয়সে একটা পকেট-ঘড়ি কিনেছিলেন। তিনি যেদিন মারা গেলেন, সেদিনও শুনি ঘড়ি থেকে টিক-টিক আওয়াজ বেরুচ্ছে। প্রায় পঞ্চান্ন বছর! ভাবলুম, আওয়াজ থাকতে থাকতে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটে এর সৎকার ক'রে আসি—ট্রামে চেপে গেলুমও ধর্মতলা পর্যন্ত—" গিলে-করা পাঞ্জাবিটা অতি সতর্কভাবে মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে দিয়ে তিনি আবার বলতে লাগলেন, "দোকানদার বললে, ধর্মতলার শ্মশানে এর গতি হবে না, দাদা। দানের সামগ্রী হওয়ার মতোও এর মধ্যে মালমশলা নেই। একে কেওড়াতলায় পাঠিয়ে দিন। বুঝলি ত্বলু, খাঁটি সুইচ-ঘড়ি! কিন্তু যতো খাঁটিই হোক, সে তো আর অমর হ'তে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীটা টিকল ব'লে পুরো বিংশ শতাব্দীর বুকেও পাড়ি জমাবে, তা কি সম্ভব? ফেরার পথে—" বিছানার তোশক ওল্টালেন রাঘবমামা, "কই রে, অল্‌সেক্‌শন ট্রাম-টিকিটটা গেল কোথায়? ও, এই তো পেয়েছি। বুঝলি ত্বলু, ভাড়াটেরা টাকা দিলেই আগে গিয়ে টিকিটের টাকা জমা দিয়ে দিই। খাই আর না খাই, টিকিটটা বাবা চাই। চল্, তিনটে বাজতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকী। দে, পানের ডিবেটা দে, সন্তু।"

ত্বলাল দেখল, ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন মামা। সে জিজ্ঞেস করল, "ওকি মামা, ছাতাটা আমাব কোলে প'ড়ে রইল যে? এটাব সম্বন্ধে কিছু বললে না তো?"

"ঐ যে বললুম, বাবা খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন। একই জিনিস ত্ব'বার কেনেননি। তোর কাজ চ'লে যাবে। আয়—"

"তা হ'লে ছাতার বক্‌লসটা তুমি অন্তত খুলে দাও, মামা। তারপর খোঁচা মেরে আমি না-হয় খোলবার চেষ্টা করব।"

"ট্রামে গিয়ে আগে উঠি তো—চল্, সেখানে ব'সে আমি খুলে দেবো। ট্রাম পর্যন্ত আমার ছাতার তলায় মাথা গুঁজে যেতে পারবি।"

সদ্যপ্রসূত শিশুর মতো ছাতাটাকে দু'হাতের ওপর শুইয়ে নিয়ে দুলাল বেরিয়ে এল বাইরে।

॥ সাত ॥

গজানন মুখুজ্জে দ্বিতীয় রাত্রিটাও যাপন করলেন মাসীর বাড়িতে। স্বাধীন ভারতবর্ষে অন্য কোথাও থাকবার জায়গা পেলেন না।

অতীত-স্মৃতি মনে পড়ল তাঁর। সেকালে থাকবার জন্য জায়গা খুঁজতে হ'ত না। আদর এবং আগ্রহ ক'রে স্বল্প-পরিচিত শহরবাসীরাও নেমন্তন্ন ক'রে বাড়ি নিয়ে যেতেন। দু'চার দিন ব'সে খেলে খুশি হতেন তাঁরা। কলকাতার মতো এতোবড় একটা বিরাট জায়গাও কালক্রমে ফতুল্লার চেয়েও ছোট হ'য়ে এল। প্রতিটি রোড, স্ট্রীট, লেন এবং বাই-লেনে অন্তত একটি ক'রে পরিচিত পরিবার খুঁজে বার করা অসম্ভব হ'ত না। ঢুকে পড়লেই আশ্রয় পাওয়া যেত। মাত্র, দশ-বারো বছরের ব্যবধানে এখানকার সব-কিছু বদলে গিয়েছে।

হিন্দুস্থান পার্কের দিকেই যাচ্ছিলেন তিনি। নলিনীদার সঙ্গে দেখা ক'রে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসবেন। দুলালের আজ আসবার কথা। ওর সাহায্য ছাড়া ভবিষ্যতের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নলিনীদা বড় ভালো মানুষ। বহু বছর দেখা হয় না। সেকালে জ্বালাময়ী প্রবন্ধ এবং সম্পাদকীয় লিখতেন। তাঁর চেহারা দেখে কেউ বুঝতে পারত না যে, নলিনীদার হৃদয়-চুল্লিতে চব্বিশ ঘণ্টাই বিপ্লবের আগুন জ্বলছে। বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়লেন গজানন মুখুজ্জে।

বোধ হয় ঘুমচ্ছেন নলিনীদা। সকাল থেকে বৃষ্টি হওয়ার দরুন নাগরিকদের ঘুম আসাই স্বাভাবিক। গতকাল কলকাতার তাপমাত্রা খুবই বেড়ে গিয়েছিল, একশো দশ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

এবার একটু জোরেই কড়া নাড়লেন তিনি।···দশ-বারো বছর আগে তাপের মাত্রা এত বেশি বাড়তে তিনি কখনও দেখেননি। ধুলো এবং ধোঁয়ার সঙ্গে কয়লার গুঁড়ো মিশে গিয়ে গায়ের চামড়ায় এসে লাগে। চিবুকের তলা থেকে তিন বস্তু ঘামের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চ'লে আসে গেঞ্জির অভ্যন্তরে। এ বড় অদ্ভুত অনুভূতি, একেবারে নতুন!

নলিনীদা দরজা খুললেন। বোধ হয় বাইরে বেরুবেন। ইস্ত্রি-করা খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন। গজাননবাবুর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "গজা না? আয়, আয়। এই সময়ে কেউ কোনোদিনও কড়া নাড়ে না ব'লে ভাবলুম, পাশের বাড়ির দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। অফিসে যাচ্ছি। যেতে হবে বর্মন স্ট্রীট.। তার পর, কেমন আছিস, কোথায় কাজ করছিস?"

"এই তো সবে আন্দামান থেকে ফিরলুম।"

"বলিস কি! আগেকার দিনে অন্তত ত্রিশটা সম্পাদকীয় লেখা যেত—ভালো সাবজেক্ট।"

"অনেকদিন তোমার লেখাটেখা আর পড়ি না, নলিনীদা। আচ্ছা, তুমি তো বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছিলে। কেমন কাটল?"

"সে তো বছর-দশ আগে বিক্রি হ'য়ে গিয়েছে। তারপর আর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়নি। প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কেন?"

"বোধ হয় এ-যুগের ছেলেরা কেউ আর দিশী বিপ্লবের ইতিহাস জানতে চায় না। প্রকাশকরা পয়সা খরচ করতে ভয় পাচ্ছেন। ইংরেজ-শাসন অফিসিয়েলী শেষ হওয়ার পর দেখছি বিদেশী জিনিসের অভাববোধ বেড়ে গিয়েছে। এমনকি বিদেশী বিপ্লবের বই পেলেও এ-যুগের যুবক-যুবতীরা দোকানের সামনে 'কিউ' দেয়—বই কেনে। চল্‌-না গজা, অফিসে ব'সে গল্প করা যাবে।

দু'ঘণ্টার বেশি লেট করলে খবরের কাগজের মালিক রাগ করেন খুব।”

“এমন মালিকের একখানা জীবনী লেখো, নলিনীদা। খুব বিক্রি হবে।”

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করবার জন্য নলিনীদার ছোট মেয়েটা অপেক্ষা করছিল।

ওঁরা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এলেন। হিন্দুস্থান পার্ক থেকে গড়িয়াহাটা পর্যন্ত হাঁটতে হবে। সেখানে পৌঁছে ট্রাম ধরবেন নলিনীদা।

গজাননবাবু বললেন, “তোমার অফিসে অন্য একদিন যাব। আজ একটা জরুরী কাজ আছে।”

“কোন্ দিকে ?”

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না গজাননবাবু। ভেবে নিয়ে বললেন, “আউটরাম-ঘাটের কাছাকাছি।”

“বুঝেছি, মোহনবাগানের খেলা দেখবার জন্য ব্ল্যাকে টিকিট কিনতে যাচ্ছিস।”

“না, নলিনীদা। একজন ইয়ং রিভলিউশনারির আসবার কথা আছে।”

চৌরঙ্গীর ট্রাম এসে গিয়েছে। নলিনীদা উঠে পড়লেন। উঠবার আগে তিনি এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, গজাননবাবু লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন। বোধ হয় আটচল্লিশ সালের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনো ইয়ং রিভলিউশনারির জন্ম হয়নি। যাঁরা ছিলেন তাঁরা চাকরি করছেন, ব্যবসা করছেন—কারখানার, কিংবা চা-বাগানের মালিক। সেইজন্যই কি নলিনীদার বিপ্লবের ইতিহাস এ-যুগের যুবক-যুবতীরা পয়সা দিয়ে কিনতে চায় না ? হয়তো বিশ্বাস হারিয়েছে।

হাতে এখনো অনেক সময়, বিকেলের আগে দুলাল আসবে

না। ট্রামে কিংবা বাসে উঠলেন না গজানন মুখুজ্জে। গড়িয়াহাটার মোড় থেকে পদযাত্রা শুরু করলেন তিনি। বেলা ছুটো। এই অঞ্চলে এখন পথে-ঘাটে ভিড় নেই। বাবুরা সবাই খেয়েদেয়ে অফিসে গিয়েছেন। মেয়েরাও নিশ্চয়ই ঘুমচ্ছেন।

নাঃ, এদিকে আর অনর্থক সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। তুলালই এখন একমাত্র ভরসা। গঙ্গার ধারে তাড়াতাড়ি পৌঁছনো দরকার। স্বপ্নটপ্ন কি দেখল তুলাল মিলিয়ে দেখতে হবে। গতকাল মাসীর সঙ্গে গল্প করতে করতে রাত প্রায় শেষই হ'য়ে গিয়েছিল। স্বপ্ন-দেখার সুযোগ পাওয়া যায়নি। বিকেলবেলা কাল এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার জন্য সারারাতই গৃহস্থবাড়িতে লোকজনের আসা-যাওয়া চলেছে। একশো দশ ডিগ্রীর তাপ নেমে এসেছিল নব্বুই-এর ঘরে। মদন কি করেছে কে জানে। হাজরা লেনের মধ্যে দিয়ে শর্ট-কাট ধরেছেন গজাননবাবু। লেন থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর মনে পড়ল মদন তো এখনো সাবালক হয়নি! মাত্র একবছর বয়স। নাকের ওপরে একগুচ্ছ কচি ঘাস। পেকে পেকে শক্ত হ'তে বছর-তিন লাগবে। যতো পাকবে ততো ধারও বাড়বে। মদনকে তখন তুলাল কি ক'রে যে শাসন করবে ভেবে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন গজাননবাবু। লক্ষ্মীবাবুর সন্তানদের সোনা-রুপোর দোকানগুলো ডান হাতে রেখে বড়রাস্তাটা পার হ'য়ে এলেন তিনি। তারপর সেই পুরনো মন্দিরটা চোখে পড়ল তাঁর। ময়দানটা আর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ডান দিকে মোড় ঘুরতে গিয়ে দেখলেন দেওয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে চৌরঙ্গী টেরেস। আঠারো-কুড়ি বছরের এক যুবক গজানন মুখুজ্জের পায়ের ধুলো নিল। কে? চিনতে পারলেন না। বোধ হয় মন্দিরের দেবতাকেই প্রণাম করছিল সে, হঠাৎ তিনি মোড়ের মাথায় এসে উপস্থিত হওয়ায় ফালতো একটা প্রণাম পেয়ে গেলেন। পাশ কাটিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন গজাননবাবু। যুবকটি পথ আগলে বলল, "মামা,

আমায় চিনতে পারছ না? আমি দেবী। এই রাস্তায় আমরা থাকি। নতুন বাড়ি। দক্ষিণ খোলা। তুমি না আন্দামানে ছিলে, মামা? কবে ফিরলে?"

"পাগল! সে তো এক যুগ আগেকার কথা। কি করছিস তুই?"

"এম্. এ. পাস করেছি।"

"কেন?"

প্রশ্ন শুনে ভড়কে গেল দেবীপ্রসন্ন। হঠাৎ যেন মন্দির থেকে কেউ বুঝি একটা থান ইট ছুঁড়ে মারল ওর বুকে! দেবদেবীর ওপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল গজাননবাবুর ভাগ্নে। মন্দিরের দিকে পিছন ফিরে দেবীপ্রসন্ন বলল, "ফার্স্ট্ ক্লাশ ফার্স্ট্ হয়েছি, মামা।"

"কী পরীক্ষায়?" উত্তরদিকে হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলেন গজাননবাবু।

"এম. এ.।"

"ছোঃ, ও আবার একটা পরীক্ষা নাকি? আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের কথা শুনলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব-ক'টি অঙ্গ একসঙ্গে জ্বলতে থাকে! মাকে বলিস, পরে একদিন দেখা করব।" পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলেন গজানন মুখুজ্জে।

"মা তো নেই—"

"নেই? কি ক'রে থাকবেন! এমন পাপের সংসারে না থাকাই ভালো।" তারপর আরও দু'একটা কথা কি যে বললেন তিনি, শুনতে পেল না দেবীপ্রসন্ন। সাংঘাতিক অপমানিত বোধ করল সে। কি কারণে হঠাৎ ওর মন্দিরটার ওপরে ভীষণ রাগ হ'তে লাগল। এই অপমানের জন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাই দায়ী। মন্দির থেকে সত্যি সত্যি কেউ একটা ইট ছুঁড়ে মেরেছে ব'লে ভাবতে লাগল দেবী। বড্ড ছেলেমানুষ।

এস্প্লানেডে পা দিয়েই দুলাল টের পেল, গা বাঁচিয়ে এ-পথ দিয়ে গঙ্গার ধারে যাওয়া অসম্ভব। কলকাতার অর্ধেক লোক এখন এ-অঞ্চলে এসে উপস্থিত হয়েছে। চতুর্দিকে কিলবিল করছে মানুষ আর মানুষ। মানুষের ভয়ে আজ বে-ওয়ারিস গরুগুলোও এস্প্লানেডের দিকে আসেনি। দুলাল বলল, "মামা, তুমি মাঠে যাও। আমি অন্য পথ দিয়ে আউটরাম-ঘাটে গিয়ে পৌঁছব।"

"কেন, এইটেই তো সিধে রাস্তা।"

"আমি বাঁকা ধরব। ভয় করছে!"

"এই ক'টা লোক দেখেই ভয় করছে? তুই না বিপ্লবী?"

"নিজের জন্য ভয় নেই। ডালহাউসি স্কোয়ার হ'য়ে বড় পোস্ট-অফিসের পাশ দিয়ে স্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়ব। সেখান থেকে আবার দক্ষিণদিকে পথ ধরব। একটু সাবধান না হ'লে একে আমি বাঁচাতে পারব না। মামা, তুমি তো বলেছিলে ট্রামে উঠে ছাতার বক্‌লসটা খুলবে—"

"ও, ছাতার জন্য ভয় পাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ। কারো হাত-পায়ের চাপ লাগলে, ছাতার অবস্থা কি যে হবে বলতে পারি না। পরে তুমি বলবে, আমার হাতে উঠেই তোমার বাবার ছাতাটা ছিঁড়ে গিয়েছে। আমি কেন দায়ী হ'তে যাই মামা? চলি। রাত্রে একে ঠিকমতো চিলেকোঠায় পৌঁছে দিতে পারলেই ভাবব, দাদামশায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি আমি।"

ডালহাউসির পথই ধরল দুলাল। বড়রকমের ভিড় দেখলেই ফুটপাথ থেকে নেমে দাঁড়ায়। ভিড়টা চ'লে গেলে আবার হাঁটতে আরম্ভ করে। মামার লীলা বোঝা মুশকিল। চিলেকোঠা থেকে হঠাৎ তিনি দাদামশায়ের সম্পত্তিটা বার ক'রে আনতে বললেন কেন? নারকোলের দড়ি দিয়ে যে-সম্পত্তিটা বেঁধে রেখেছেন তিনি, তা দিয়ে যে সংসারের কোনো বিপদই আটকানো যাবে না তেমন বিবেচনা কি তাঁর নেই? ছাতার অভ্যন্তরটা হয়তো সমূলে

বিনষ্ট হয়েছে। মামার চালাকি ধ'রে ফেলেছে তুলাল। আগামীকাল মেরামতের জন্য টাকা চাইবার সুযোগ সে তাঁকে দেবে না। বসু-রায়দের অতো বড় একটা তিনতলার ছাদ, তাতে মাত্র এক লাখ ফুটো—আর এইটুকু একটা ছাতা, তার গায়ে অন্তত লাখ-তুইয়ের কম হবে না। বিচলিত বোধ করল তুলাল। রাত্রে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে। ট্রামে-বাসে উঠে রিস্ক্ নেওয়া চলবে না। অত্যন্ত সতর্কভাবে পথের চতুর্দিকে নজর রাখতে রাখতে ইডেন-উদ্যানের পাশ দিয়ে সেই পুরনো স্থানটিতে এসে পৌঁছল সে। ঘাসের ওপর জল জ'মে রয়েছে। সামনেই একটা বেঞ্চি ছিল, সেটাতেই ব'সে পড়ল তুলাল। যেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পার হ'য়ে এসে নিরাপদ বন্দরে পা ঠেকাল সে।

একটু পরেই গজাননবাবু এলেন। তা হ'লে নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে পৌঁছেছে তুলাল! ওর মনের অবস্থা নিমেষের মধ্যেই বুঝে ফেললেন গজানন মুখুজ্জে। তুটো হাতই ওর দিকে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি ডাকলেন, "আয়, আয় তুলাল। তোকে একবার আলিঙ্গন করি। আটচল্লিশ ঘণ্টার ছাড়াছাড়িও নয়, মনে হচ্ছে যেন অর্ধশতাব্দীর দ্বীপান্তর ভোগ ক'রে ফিরে এলুম!"

"তা যা বলেছ, গজুদা। পায়ের ধুলো দাও। তারপর বলো—সবাই চিনতে পারলেন তো তোমাকে?"

"হ্যাঁ, পারলেন। কিন্তু—" চুপ ক'রে গেলেন গজাননবাবু।

তুলাল একদৃষ্টিতে চেয়ে ছিল তাঁর দিকে। একটু পরেই সে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু কি, বললে না তো গজুদা?"

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গজাননবাবু বললেন, "কিন্তু আমি কাউকে চিনতে পারলুম না।"

তুলাল মুখ নিচু ক'রে রইল। গজানন মুখুজ্জেও অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইলেন আউটরাম-ঘাটের দিকে। আন্দামানগামী জাহাজখানা এখনো বন্দরে লেগে রয়েছে। আন্দামানের অতীতটা যেন জলের

ওপর ভাসছে। ভালো লাগছে দেখতে। আটচল্লিশ ঘণ্টার দম-আটকানো অনুভূতি আর নেই। মুক্তির স্বাদ পেলেন গজাননবাবু।

টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল। তিনি বললেন, "ছাতাটা খোল্-না, দুলাল।"

"দুপুর থেকে চেষ্টা করছি।—ব্যাপারটা কি জানো গজুদা? এ চলবে না।"

"তার মানে কি? বুঝিয়ে বল্।"

"ভেতরে এব কিছুই নেই। আমার দাদামশাই এই ছাতাটি মাথায় দিয়ে বাগনান যেতেন। গজুদা, বিপ্লবেব আগুনে একে ভালো ক'রে শুকিয়ে নিতে হবে। তাবপর যদি পাবো তো ব্যবহার কোরো।"

"আবার বিপ্লব?"

"নইলে এ খুলবে না। খুলতে চেষ্টা কবো, দেখবে, এটিকে আব ছাতা ব'লে চিনতে পাববে না। তুমিও তো কাউকে চিনতে পারোনি, গজুদা?"

"ও, তাই বল্! তুই কলকাতার সমাজেব কথা বলছিস?"

"ভারতবর্ষের। রাজা-ফাজা হওয়ার দবকার নেই তোমার। আমরা বিপ্লবী হ'য়েই থাকি। দেশেব সবাই যেদিন নিজেদের চাহিদামতো আর্থিক সুখ-সুবিধাব অধিকারী হবে সেদিন আমবা আব বিপ্লবী থাকব না।"

"তোব কাছে আর মূলধন কতো আছে রে, দুলাল?"

"এগারো আনা।"

"আমার আছে শুধু সাড়ে-পাঁচ আনা। অতোদিন পর্যন্ত চালিয়ে নিতে পারবি তো?"

"যখন চলবে না, তখনই তো বিপ্লবেব আগুন জ্বলবে। কাল বিকেলে কমলদার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। ডালহাউসি স্কোয়ারে গিয়েছিলুম বেড়াতে। মস্ত বড় একটা উঁচু বাড়ির সামনে

দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসেব করছিলুম, বাড়িটা ক'তলা। এমন সময় পেছন থেকে মাথায় আমার চাঁটি মারলেন কমলদা। জিজ্ঞেস করলেন, 'বোকার মতো হাঁ করে দেখছিস কি? এটা তাজমহল নয়।' বুঝলে গজুদা, ঠিক তোমার মতো কমলদাও আমায় তাঁর বুকের ওপর টেনে নিয়ে বললেন, 'চল্, বারোছুয়ারীতে গিয়ে বসি। পুরো দেশটাই দেখতে পাবি।' সেই হাসিখুশি মুখ, তেমনি আমুদে মানুষটি রয়েছেন দেখলুম। আগে সব সময়েই ঘাড়ের ওপরে একটা ঝোলা থাকত। ঝোলার মধ্যে থাকত গাদা গাদা বই। কাল দেখলুম, ঝোলাটা নেই। জিজ্ঞেস করলুম, 'ঝোলা কই তোমার কমলদা?' তিনি ডিবে থেকে পর পর ছু' খিলি পান বার ক'রে খেয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, 'পৃথিবীতে ভালো লেখক আর জন্মাচ্ছে না ব'লে বই-পড়া ছেড়ে দিয়েছি। এখন শুধু চাকরি করি। লাইব্রেরির চাকরি। আমি লাইব্রেরিয়ান। মাসে মাসে মাইনে পাই। সবটা একসঙ্গে পাওয়া যায় না, ছু'তিন কিস্তিতে শোধ হয়। তুই না আন্দামানে ছিলি রে?' বললুম, 'কাল ফিরেছি।' খবর শুনে কমলদার তামাটে মুখের রং যেন ঝলসে গেল! লালদিঘি থেকে এস্প্লানেড পর্যন্ত একটি কথাও আর বললেন না। সন্ধের পর বারোছুয়ারীতে গিয়ে বসলুম আমরা। গলা একটু ভিজে উঠবার পর কমলদার মুখে ভাষার জন্ম হ'ল। মাটির ভাঁড়টা হাত দিয়ে চেপে ধ'রে বললেন, 'বিংশ শতাব্দীটা যদি শেষ ক'রে আসতিস তা হ'লে চাকবি-বাকরির খানিকটা সুবিধে পেতিস।' ভারি দমে গিয়েছেন কমলদা। ছোটগল্প লেখাও ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শুধু একটা বড়গল্প লিখবেন। রাত আটটা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলুম।"

"ক' পাঁট টানলি?"

"মাত্র ছু' পাঁট। কমলদা বললেন, 'আর খেয়ে কি করবি? মাত্র বারো আনা খরচ ক'রেই তো পুরো দেশটাকে দেখলি এখানে।'

গজুদা, ভারি একটা মজার ব্যাপার দেখলুম। প্রত্যেকেই অসুখী, সবার মুখেই প্রতিবাদের ভাষা। অথচ মনে হ'ল, এঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো। পকেটে পয়সা আছে।"

"তা হ'লে বারোদুয়ারীতে গিয়ে বাংলা মদ গিলছেন কেন রে?"

"বোধহয় পুরনো অভ্যাস ছাড়তে পারছেন না। গজুদা, তুমি হাসছো? না না, হাসবার ব্যাপার নয়। বড়বাজারের মোফতলালকে ছাখোনি? আগে ফিরি ক'রে কাপড় বিক্রি করত। তারপর বুড়োবয়সে লক্ষপতি হ'ল। কিন্তু বিড়ি খাওয়া ছাড়তে পারলে না। সিগারেটের গন্ধ পেলে বমি আসত তার। কমলদা বললেন, 'গল্প লিখে লাভ নেই, দুলু। এখন মোফতলালরাই সব-কিছু কণ্ট্রোল করছে। বিড়ির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। ভার্জিনিয়ার স্বাদ পায়নি ওরা।' গজুদা, জানো, বিজয় মান্নার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"কোথায়?"

"বারোদুয়ারীর গেটের বাইরে। মস্ত বড় একটা নতুন গাড়ি। ভেতরে বসে চুক চুক ক'রে কালী-মার্কা টানছিলেন। আমি দেখতে পেয়েই বললুম, 'কেমন আছ বিজয়দা? পাশে উনি কে? বৌদি নাকি?' বিজয় মান্না সোজা হ'য়ে উঠে বসল। দরজার দিকে ঝুঁকে ব'সে বলল, 'ব্যাপার কি রে দুলাল? একবাব দেখা করতে এলি নে? আজ তোর মামাকে দশ টন সিমেন্টের পারমিট ক'রে দিয়েছি। তিনি বললেন যে, খুবই অভাব যাচ্ছে তোর। পাবিস তো, কাল একবার আসিস। সরোজিনীর সঙ্গে এসে আলাপ করলে পূর্ববঙ্গের সব ভেতরের খবর জানতে পারবি। খবরের কাগজে আর কতোটুকু বেরয় বল্!' গজুদা, দেখলে, বিজয় মান্নার মতো ক্যাপিটালিস্টও কালী-মার্কা খায়?"

"খাবেই তো। তোদের রবি ঠাকুর এতো বই লিখলেন, দেশের লোকের তবু স্বাদ বদলালো না। হ্যাঁ রে, দুলু, মদ্‌নার খবর কি?"

বেঞ্চির ওপর পা তুলে জোড়-আসন কেটে বসল দুলাল। তলা থেকে ড্যাম্প উঠছিল। পেটে বেশি প্রোটিন যাচ্ছে না। শরীরটা দুর্বল। পায়ের তলা দিয়ে এতো বেশি আর্দ্রতা ঢুকে পড়লে অসুখ করতে পারে। পকেটে মাত্র এগারো আনার মূলধন। অসুখের শৌখিনতা করবার মতো অবস্থা নয় ওর। ভিজিটের বদলে গায়ের হাড়মাংস খুলে দিলেও ডাক্তাররা রাগ করবেন। মর্গের জিনিস ওঁরা পকেটে রাখবেন না।···মহামেডান স্পোর্টি' বোধ হয় গোল খেল! চিৎকারের গভীরতা প্রচণ্ড। ব্যাপকতাও কম নয়। আঁতুড়-ঘর থেকে মামীমাও শুনতে পাচ্ছেন। মামার স্পেকুলেশন ঠিক হয়নি। জুয়াখেলায় হেরে গেলেন তিনি।

দুলাল বলল, "মদ্‌নার অবস্থা খুব ভালো, গজুদা। তিনতলার উঁচু সমাজে বাস করছে। উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম সব দিকই খোলা। গজুদা—" চুপ ক'রে গেল দুলাল। গজাননবাবু বললেন, "সমাজের উঁচুতে সুখ-সুবিধা তো থাকবেই। যাক, খুবই আনন্দের কথা, মদ্‌না তার উপযুক্ত স্থান থেকে বিচ্যুত হয়নি। নাকের দিকে লক্ষ্য রাখিস, কচি-কচি রোঁয়াগুলো ফস্‌ ক'রে শক্ত না হ'য়ে যায়। শক্ত হ'লেই কিন্তু গুঁতোতে আরম্ভ করবে।"

"তোমার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু মদ্‌নার মধ্যে বোধহয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্ম হ'ল।"

"কি রকম?"

"তিনটে তুলসীগাছ খেয়ে ফেলেছে। শেকড়-সুদ্ধু খেয়েছে। তারকেশ্বরের পা-ছোঁয়ানো তুলসীগাছ!"

"দুলাল, সিরিয়াস কথা আর ভালো লাগে না।" হাই তুললেন গজানন মুখুজ্জে। খেলা শেষ হয়ে গেছে। ইডেন-উদ্যানের দিক থেকে গাড়ির স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। গজাননবাবু বললেন, "এক বাটি ক'রে চা খেলে হ'ত না?—ডাক্‌-না ঐ চা-ওয়ালাকে। সব-ক'টি পয়সা শেষ না হ'লে তো বিপ্লব শুরু হবে না বললি।"

বেঞ্চিতে ব'সেই চা-ওয়ালাকে ডাকল দুলাল। বার-পাঁচেক ডাকবার পর জবাব দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল চা-ওয়ালা। তার সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি। মোহনবাগান না জিতলে এই উজ্জ্বলতা দেখতে পাওয়া অসম্ভব হ'ত। সে ঘুরে দাঁড়িয়েই বলল, "চা খতম হো গিয়া।" খিদিরপুরের বাস্ ধরবার জন্য অপেক্ষা করছিল সে।

"যাক্‌গে, এসব ছোটখাটো ব্যাপারের জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই, দুলাল। কতো চা-ওয়ালা আসবে, আবার চ'লেও যাবে। নোট-বই বার কর্ এবার। কি দেখলি বল্—আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবাই হচ্ছে আসল কাজ।" ছাতার ওপর হাত রাখতে যাচ্ছিলেন গজানন মুখুজ্জে। ফস্ ক'রে ছাতাটা সরিয়ে নিল দুলাল। নিবাপদ জায়গায় সবিয়ে রেখে সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি দেখলে গজুদা ?"

"তুই আগে বল্—নোট-বইতে আমি সব লিখে রেখেছি।"

"ভয় করছে গজুদা, যদি না মেলে !"

"সাড়ে-পাঁচ আনায় এসে ঠেকেছে, এখনো যদি না মেলে, কবে যে আর মিলবে বুঝতে পাবি না। দুলাল—"

"দাদা—" পকেট থেকে নোট-বই বাব করল দুলাল। গজানন-বাবুও গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা খুললেন। লোকের ভিড় আর নেই। মাঝে মাঝে টিপ টিপ ক'বে বৃষ্টি পড়ছে ব'লে গঙ্গার ধারে কেউ আজ হাওয়া খেতে আসেনি। অন্ধকাব হয়ে এসেছে। উইলিয়াম দুর্গ থেকে বোধহয় সময়সূচক ঘণ্টা বাজল। ছ'টা।

দুলাল বলল, "দাদা, গোড়া থেকে কাল পর্যন্ত যতোবাবই স্বপ্ন দেখলুম, প্রতি বারই একটা জিনিস 'কমন' পড়ল !"

"কি রে সেটা ?"

"আমরা কারবার করছি।"

"আমারও ঠিক তাই ! আমি ম্যানেজিং ডাইবেক্টার, তুই জেনারেল ম্যানেজাব—"

"বিরাট বড় অফিস—"

"তিনতলার সব-ক'টি তলাতেই লোক গিজগিজ করছে—"

"সর্বভারতীয় জনতা—"

"যথার্থ। সেই ঠিকেদার কৃপাল সিং পর্যন্ত অফিসে এসেছে। কিন্তু কিসের কারবার করছি আমরা, দুলাল?"

"তাই তো, কি নিয়ে যে কারবার চলছে বুঝতে পারলুম না। যখন ঠিক বুঝব-বুঝব হচ্ছে, তখন এসে উপস্থিত হ'ল সেই মেয়েটা। জাহাজ থেকে ভোগাচ্ছে। মেয়ে-ফেয়ে এসে হাজির হ'লেই স্বপ্ন আর টেঁকে না।"

গজাননবাবু সহসা গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। ধমকানির স্বরে বললেন তিনি, "দুলাল, আমার বিশ্বাস ছিল, তোর চরিত্র খুব ভালো। দাগ পড়েনি। গাধার দুধের মতো সাদা, ধবধব করছে। সেই বিশ্বাস আমার ভেঙে দিলি, দুলু? জানি, স্বপ্ন দেখছিস। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যেই বা মেয়ে আসবে কেন তোর কাছে? পটলীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবি রে?"

দুলালের দুটো চোখই ছলছল করতে লাগল। গজানন মুখুজ্জের পায়ের ধুলো নিয়ে সে বলল, "মা-কালীর দিব্বি, বিশ্বাসঘাতক আমি নই। শোনো গজুদা, শোনো—মাথাটা একটু নিচু করো।" গজাননবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে দুলাল দত্ত ফিসফিস করে বলল, "স্বপ্নে তো শুধু পটলীই আসে!"

অন্ধকার এবার ঘন হয়ে এসেছে। চা-ওয়ালারা বোধহয় কেউ আর আসবে না। রোজগারের আর দরকার নেই। খেলার মাঠে প্রচুর লাভ হয়েছে আজ। তেষ্টায় দুলালের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। গজাননবাবুর তেষ্টাও কম নয়। সেই গড়িয়াহাটার মোড় থেকে হেঁটে এসেছেন। চারদিকে ভালো ক'রে দেখলেন গজাননবাবু, না, কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সোডা-লেমোনেডের ঠেলা-গাড়িও চোখে পড়ল না। মা-গঙ্গা ছাড়া আর কি উপায়?

একটা ট্রাক খুব দ্রুতগতিতে উত্তর দিকে বেরিয়ে গেল। বোধ-হয় খিদিরপুরের ডক্ থেকে বড়বাজারের গুদামে যাচ্ছে মাল নিয়ে। অন্ধকার হ'লেও গজাননবাবু দেখলেন, ট্রাকের ওপরে সব কাঠের বাক্স। দুলাল বলল, "তুমি একটু বোসো গজুদা, আমি দেখে আসি।"

"কি দেখতে চললি ?"

"ধুপ্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'ল। মনে হয়, একটা বাক্স প'ড়ে গিয়েছে। নিয়ে আসি। থানায় গিয়ে জমা দিয়ে দেবো।"

"তোর মতো সাধু-চরিত্রের যুবক বোধহয় আজকালকার বাজারে দুটি আর নেই। যা, নিয়ে আয়।"

একটু বাদেই ফিরে এলো দুলাল। সত্যিই একটা কাঠের বাক্স চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে এলো সে। বলল, "গজুদা, ও ব্যাটারা আমাদের জন্যই বাক্সটা ফেলে গেছে। আমরা তৃষ্ণার্ত—অনুমতি দাও গজুদা···হায় হায় কী জিনিস রে বাবা! মা-কালী পর্যন্ত লোভে পড়তেন। গজুদা, এক বাক্স খাঁটি স্কচ!! নাও, কতো খাবে খাও।"

কাঠের বাক্সটা খোলবার জন্য সংগ্রাম করতে লাগল দুলাল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পর গজানন মুখুজ্জেও সংগ্রামে যোগ দিলেন। যন্ত্রপাতি কিছু নেই, লোহার পাটিটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল দুলাল। রাস্তার ওপাশে রেল-লাইনের ধার থেকে ইট-পাটকেল এবং একটা ছোট আকারের পাথর সংগ্রহ ক'রে আনলেন গজানন মুখুজ্জে। সেকালের ভেটারেন বিপ্লবী তিনি, সংগ্রাম করতে আজও ভয় পেলেন না। আধ ঘণ্টা পর বাক্স খুলল। চ্যাপ্টা ধরনের একটা বোতলের মুখ খুলে গজাননবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে দুলাল বলল, "নাও, ধরো। গজুদা, তুমি আজ ওমর-খৈয়াম, আমি তোমার সাকরেদ। ইংলণ্ডবাসীদের খুরে দণ্ডবৎ। আট-চল্লিশ ঘণ্টা পর প্রথম এই সত্যিকারের সংস্কৃতির গন্ধ পাচ্ছি, গজুদা!

ঘণ্টা-দুই পরে ব'সে থাকা অসম্ভব হ'ল

শুধু খবরের কাগজে ষোলো ইঞ্চি ক'রে বিজ্ঞাপন ছাপলেই কি সংস্কৃতি জন্মায়? মদ্‌না ব্যাটা আজ মাথা ঠুকে মরবে। ও কি করছ, গজুদা—আধ পাঁট যে এক নিশ্বাসে শেষ করলে!"

"ছ্যাখ্‌ ছুলু, সর্বক্ষণ তোর সিরিয়াস কথা শুনতে আর ভালো লাগে না।"

ঘণ্টা-ছুই পরে ব'সে থাকা অসম্ভব হ'ল। বিলিতী সংস্কৃতি পান করতে করতে গজানন মুখুজ্জে শুয়ে পড়লেন মাঠে। ছুলালও দেরি করল না। গজাননবাবুর বুকের কাছে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে। বিক্ষোভ নেই, প্রতিবাদের ভাষাও ফুরিয়ে গিয়েছে।

ঘুমের মধ্যে ছুজনেই স্বপ্ন দেখছে, এবং একই রকমের।

প্রকাণ্ড শহর। লোক আর লোক। ডাইনে লোক, বাঁয়ে লোক, সামনে এবং পেছনেও লোক। মাথার ওপরে হেলিকপ্‌টার ডুলছে, পায়ের কাছে মোটরগাড়ি ছুটছে। লোক মরছে কম, জন্মাচ্ছে বেশি। দেশের খাদ্য খেয়ে ফেলতে ছ' মাস লাগে, বাকী ছ' মাসের জন্য খাদ্য আসে বিদেশ থেকে। আজ ধারে, ভবিষ্যতে দাম দিতে হবে। অতএব যতো পারো খাও। হজম না হয়, তবু খেয়ে যেতে হবে। আজ যখন ধার পাওয়া গেছে, কালকেও পাওয়া যাবে। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা।

আজব শহর। মজার ব্যবসা। অফিস-কোয়ার্টারে হৈ-চৈ। খালি ঘর আর একটিও নেই। 'শোকসভা কোম্পানি' তিনতলা বাড়ি একটা নিজেরাই তৈরি ক'রে ফেলেছে। তাতেও কুলচ্ছে না। চারতলা তুলতে হবে। একশো-তলা খাড়া করবার অনুমতি নেওয়া আছে। অনুমতি দিয়েছে করপোরেশন।

শোকসভা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার গজানন মুখার্জী। প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছে। 'পদ্মভূষণ' সার্টিফিকেট তিনি পেয়েছেন। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস—পাকড়াশী দাদারা থ মেরে গিয়েছেন। খবর শুনে কালীচরণ দাশগুপ্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। শয্যাশায়ী। উঠে বসলেই মাথা ঝিমঝিম করে। কী সাংঘাতিক ভুল করেছেন তিনি! গজাননকে সেদিন এক পেয়ালা চা পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। শোকে, দুঃখে এবং অনুতাপে কালীবাবু জর্জরিত। নলিনীদা গোটা-ত্রিশ সম্পাদকীয় লিখে ফেলেছেন—প্রতি ছত্রে ভেটারেন বিপ্লবী গজানন মুখুজ্জের সুখ্যাতি! ত্রিশটাতে কুলবে না, দাদা, আরো লিখতে হবে, আরো অনেক। যতোদিন এক পৃষ্ঠা ক'রে বিজ্ঞাপন দেবেন ততোদিনই গজানন মুখুজ্জের পায়ে তেল মাখাতে হবে। মালিকের হুকুম।

শোকসভা কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার তুলাল দত্ত। তিনতলায় ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পাশের কামরাতেই বসে দত্ত সাহেব। মস্ত বড় কামরা। লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। চওড়াও কম নয়, প্রায় উনপঞ্চাশ ফুট তো হবেই। কাজের চাপ এতো বেশি যে, গঙ্গা কিংবা লেকের ধারে গিয়ে ব্যায়াম করবার সময় পায় না। সেইজন্য অফিস-কামরার মধ্যেই ব্যায়ামের ব্যবস্থা করেছে তুলাল। অনুমতি দিয়েছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টার। দৌড়বার জন্য পাঁচ ফুট চওড়া এবং পঁচাত্তর ফুট লম্বা একটা রাস্তা তৈরি করেছে অফিস-কামরার মধ্যে। রাস্তার তু'দিকে বড় বড় কাঠের টবে ঝাউ আর পাম বৃক্ষ। রাস্তাটা পীচ-ঢালাই নয়, মাটির। সর্বক্ষণ সিমেণ্টের গায়ে পা ঠেকিয়ে রাখলে স্বাস্থ্য খাবাপ হতে পারে। আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা অন্তত এক ঘণ্টার জন্য বর্জন করে তুলাল। প্রতিদিন সন্ধে ছ'টা থেকে সাতটা পর্যন্ত পঁচাত্তর ফুট রাস্তার ওপর হেঁটে বেড়ায়। প্রথম বছরটা হেঁটেছে, এখন দৌড়য়। পটলী একদিন বলল, "তুলালবাবু, ব্যায়াম করছেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত হচ্ছে না।"

"কি রকম?"

"পায়ের দিকটা শুধু মজবুত হচ্ছে। আয়নায় গিয়ে দেখুন, দেহের ওপরের অংশটা অনুপাতহীন।"

অফিস-কামরায় ব্যায়ামাগার খুলে ফেলল তুলাল। মুগুর, ডাম্বেল, প্যারালাল-বার—সবই এসে গেল। এক বছর পর সারা দেহে অনুপাতের সৃষ্টি হ'ল। মন্দ লাগে না দেখতে। কিন্তু হঠাৎ একদিন গজাননবাবু তুলালকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। ওর মাথায় হাত বুলতে বুলতে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি তুলু, মাথাটা এতো বেশি শুকিয়ে গেল কি ক'রে? না, এতো বেশি কাজ তোকে করতে দেবো না। ছি ছি ছি, দেহের অনুপাতে মাথাটা যে একটা ছোট্ট ঝুনো নারকোলের মতো দেখাচ্ছে!"

মাথাটা এতো বেশি শুকিয়ে গেল কি ক'রে ?

"কি করব, দিনরাত মাথার কাজ—ইন্‌টেলেকচুয়াল ব্যাপার তো!"

"না! না, তা হয় না। এ যে সাংঘাতিক ব্যাবাম!"

ডাক্তার ডাকা হ'ল। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এতো বড় ডাক্তার আর কেউ নেই। তিনি পরীক্ষা ক'রে বললেন, "ব্যারামটা ঠিক ধরতে পারছি না। একজন প্রতিভাবান ফিজিসিস্ট্‌ ডাকুন, পদার্থবিদ্যাবিৎ। নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এমন লোক হ'লেই ভালো হয়। আমাব সন্দেহ হচ্ছে, তাড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়েছে। রেডিএইশনের ব্যাপার।"

ভয় পেয়ে গজানন মুখার্জী জিজ্ঞাসা করলেন, "বাঁচবে তো?"

"বৈজ্ঞানিকদেব দয়া—" মৃদু হেসে এশিয়াব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বললেন, "এখন তো আর ভগবানের দয়ার ওপর কিছুই নির্ভর করছে না। প্রধানমন্ত্রীকে গিয়ে ধরুন, তিনি একজন ফিজিসিস্ট্‌ পাঠিয়ে দেবেন।"

"ধরতে অন্তত দিন-দুই সময় লাগবে, ততোদিন কি করব?"

"মস্তিষ্কটি একটি হিমায়ন-কক্ষে আবদ্ধ ক'রে রাখুন। আজকাল তো রেফ্রিজারেশনের সুবন্দোবস্ত সর্বত্রই আছে।"

খবর শুনে পটলী বলল, "বাবা, দিন-সাতেকের জন্য অফিস তোমাদের বন্ধ ক'রে দাও। দুনিয়ার যাবতীয় কাজ যদি তোমবা দুজনেই করতে চাও তা হ'লে এতো লোক রেখেছ কেন অফিসে? শুধু বেকার-সমস্যা মেটালেই তো চলবে না, তাদের হাতেও কাজের দায়িত্ব দিতে হবে। শুনলুম, কোন্‌ চেয়ারে কোন্‌ অফিসার বসবেন তাও নাকি তুমি নিজে ঠিক ক'রে দাও। তোমারই বা এতো চাপ সইবে কেন?"

"আমার জন্য ভয় নেই, মা। আমি ত্রিশ দিন ত্রিশ রকমেব ইনজেকশন নিচ্ছি। চিকিৎসকরা বলেন, নব্বই বছর পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে মাংস খেতে পারব। এটা বিজ্ঞানের যুগ। ভগবানের

ওপর কিছুই আর নির্ভর করছে না। দিল্লীর লেবরেটরি থেকে একজন পদার্থবিত্থাবিৎ আসছেন। দমদমে নামবেন। সেখানে আমি হেলিকপ্‌টার রেখেছি। একেবারে ছাদের ওপরে এসে নামবেন। দুলাল বড্ড ঘাবড়ে গেছে।"

হিমায়ন-কক্ষে মাথা ঢুকিয়ে শুয়ে ছিল দুলাল। শহরের যাঁরা নাম-করা বৈজ্ঞানিক ছিলেন তাঁরা সবাই আট ঘণ্টা ক'রে ডিউটি দিচ্ছেন। দুলালের শোবার ঘরটি লেবরেটরি হ'য়ে উঠেছে। নানারকমের যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন তাঁরা। যন্ত্রপাতি সব রাশিয়া আর আমেরিকায় প্রস্তুত। ছাপ-মারা রয়েছে। ভারতবর্ষ ঠাণ্ডা লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেনি ব'লে যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে অর্ধেক রাশিয়ার, অর্ধেক আমেরিকাব। তাও আমাদের কিনতে হয়নি। বাকীতে এসেছে। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত দাম দেওয়ার দরকার হবে না।

ছাদের ওপরে হেলিকপ্‌টার এসে নামল। গজাননবাবু নিজেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। ফিজিসিস্ট্‌ নেমেই হাত-ঘড়িতে সময় দেখে বললেন, "আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমায় আবার দমদম পৌঁছে দেবেন। সন্ধে ছ'টায় দিল্লীতে কনফারেন্স শুরু হবে। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বিখ্যাত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা এসেছেন। বড় মিটিং। চলুন—"

দুলালকে পরীক্ষা করলেন তিনি। মিনিট পনরো পর ঘোষণা করলেন, "মস্তিষ্কটি তেজস্ক্রিয় হয়েছে। রেডিও-অ্যাক্‌টিভ। ভয় নেই, তাড়িতচুম্বকীয় তরঙ্গের পরিমাণ খুবই কম। এখানকার বৈজ্ঞানিকদের আমি চিকিৎসার পদ্ধতিটা ব'লে দিচ্ছি।"

গজানন মুখার্জী জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ক'রে তেজস্ক্রিয় হ'ল?"

"দুধ খেয়ে। কোথা থেকে দুধ আনছেন?"

"কল্যাণীর দুগ্ধকেন্দ্র থেকে।"

"ও-দুধ আর চলবে না। ওখানকার গরুগুলোকেও ডেস্‌ট্রয় করা দরকার। কালই আমি দিল্লী অফিস থেকে অর্ডার পাঠাব।"

চিকিৎসা চলল এক মাস পর্যন্ত।

নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে দুলালের মস্তিষ্কটিকে তরঙ্গমুক্ত করতে লাগলেন স্থানীয় বৈজ্ঞানিকরা।

পট্‌লী মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে এসে দেখে যায়। একদিন দুপুরবেলা ঘরে ঢুকল সে। সান্ত্বনার সুরে বলল, "ভয় করবেন না, দুলালবাবু। মাথাটা আপনার ঝাড়পোঁছ ক'রে দিচ্ছেন এঁরা। তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ময়লাও সব সাফ হ'য়ে যাচ্ছে। এবার থেকে অতো কাজ আর করবেন না—"

"কাজের দোষ কি ? দিল্লীর বৈজ্ঞানিক তো বললেন, দুধ খেয়ে হয়েছে।"

"ও তো দিল্লী-কলকাতার ষড়যন্ত্র। এমন সুন্দর সুন্দর অস্ট্রেলিয়ান গরুগুলোকে বাবা জলের দামে কিনে ফেললেন—"

"বলো কি পাটুল! আমরা কি করব গরু নিয়ে ? আমাদের তো গরুর ব্যবসা নয়। তা ছাড়া সেখানে শুনেছি হাজার-পাঁচেক গরু আছে। অতোগুলো গরু উনি রাখলেন কোথায় ?"

"পাকিস্তানে। দাঁও মারলেন বাবা। প্রতি গরুতে একশো টাকা ক'রে লাভ। পাকিস্তানের গভর্নমেণ্ট খুব সস্তায় পেয়েছে।"

"এখন তো সস্তায় পেল, পাটুল। পরে হয়তো তামাম শিশু-রাষ্ট্রটাই তেজস্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকবে।"

"ওদের সর্বনাশ করাই তো আপনাদের কাজ। যুদ্ধ ক'রে তো ওদের সঙ্গে পারবেন না—দেখুন, গরু বেচে কতোদূর কি করতে পারেন। ছি ছি, দুলালবাবু, আপনাদের দৃষ্টি বড় ছোট। ভাবছেন, ওদের দেশে বৈজ্ঞানিক নেই ? নেই তো ব'য়ে গেছে। রাশিয়া, আমেরিকা থেকে ওরা গাদা গাদা বৈজ্ঞানিক নিয়ে আসবে।

তারপর ইউ.এন.ও.-তে গিয়ে আমাদের মুখে চুনকালি মাখাবে ওরা। ভোটের সময় রাশিয়া আর আমেরিকা অনুপস্থিত থাকলেও আপনারা হেরে যাবেন। আপনাদের সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই।”

“তোমার মাথাও বোধহয় তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠেছে, পাটুল। হিমায়ন-কক্ষে মাথাটা ঢুকিয়ে রাখবে নাকি ?”

জবাব দিল না পাটুলী। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তারপর একবছর কেটে গেল। দেহের অনুপাতে মাথার সাইজ ঠিক হ'য়ে গিয়েছে ছুলালের। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে গজাননবাবু সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। ছুজন ফুল-টাইম বৈজ্ঞানিক রেখেছেন তিনি মোটা মাইনে দিয়ে। খাদ্য পরীক্ষা করেন তাঁরা। পরীক্ষিত না হ'লে এক গেলাস জল পর্যন্ত খান না। ছুলালকেও এই নিয়ম মেনে চলতে হয়।

তিনতলাতেই ছুলালের কোয়ার্টার, অফিস-কামরার সংলগ্ন। গজাননবাবুরও ঠিক একই রকমের ব্যবস্থা। তাঁর দিকে তিনখানা ঘর, ছুলালের দিকে ছুখানা। গজাননবাবু বলেছেন, ছুলাল যখন বিয়ে করবে তখন তিনি ছু-কামরার ফ্ল্যাটে উঠে আসবেন। এক হেঁসেলেই রান্না হয়। গজাননবাবুর ফ্ল্যাটে গিয়ে খেয়ে আসে ছুলাল। মাঝে মাঝে কাজের চাপ যখন খুব বেশি হয় তখন পটলী নিজে আসে খাবার নিয়ে ছুলালের অফিস-ঘরে। নিজ হাতে খাওয়ার ফুরসত পায় না ব'লে পটলীকে খাইয়ে দিতে হয়।

দোতলার পুরোটাই অফিস। একতলার অর্ধেকটাতে কেরানী-বাবুরা বসেন। বাকী অর্ধেকটাতে শোকসভার প্রদর্শনী-হল্। বড় বড় নাম-করা খদ্দের এলে সত্যিকারের সভা ডাকা হয় এখানে। মঞ্চের ওপর গজাননবাবু সভাপতি হ'য়ে বসেন। ছুলাল হয় প্রধান বক্তা। কাঁদবার জন্য কোম্পানির মাইনে-করা লোক আছে। ফী অনুসারে শোকপ্রকাশের ব্যবস্থা। গোড়াতে ফী খুব কম ছিল,

মাত্র দশ টাকা। এখন সবচেয়ে কম ফী হচ্ছে মাত্র একশো টাকা। যাওয়া-আসার খরচ খদ্দেরদের বহন করতে হয়। একশো টাকা ফী দিলে শোকসভা কোম্পানি মৃতব্যক্তির হ'য়ে পার্কে গিয়ে মিটিং করে। মিটিং-এর সময় মাত্র দশ মিনিট। গজাননবাবু কিংবা তুলাল সে-সব কম-পয়সার মিটিং-এ উপস্থিত থাকে না। অফিসের বাবুবাই সভার কাজ ক'রে আসেন। বেতনভোগী কাঁতুনে কর্ম-চাবীরাও কেউ যায় না। পাঁচশো টাকা ফী পেলে তবেই এরা সভায় গিয়ে কাঁদে। তাও ফী অনুসারে কাঁদবাব নিয়ম। পাঁচশোতে টিপ-টিপ, সাড়ে সাতশোতে ইল্‌শে-গুঁড়ি, হাজারে ভেউ-ভেউ। প্রদর্শনী-হলে কেউ যদি নমুনা দেখতে চান, তা হ'লে আলাদা ফী দিতে হয়। তুলালেব আসল কাজ হচ্ছে মৃতব্যক্তিদের সম্বন্ধে বক্তৃতা লেখা। স্পীচ-রাইটাব। কোম্পানির যখন জন্ম হয়নি তখন শুধু বিখ্যাত লোকদের মৃত্যুতে শোকসভা ডাকা হত। এখন দেশের সাধারণ লোকবাও মৃত্যুব পবে সম্মানিত হন। খবরেব কাগজে তাঁদেব জীবনবৃত্তান্ত ছাপাও হয়। এইজন্য শোকসভা কোম্পানি খবরের কাগজেব মালিকদেব সঙ্গে একটা পৃথক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। চুক্তির শর্তগুলো গোপন। ইন্‌কাম ট্যাক্স বিভাগেব ব্লাড-হাউণ্ডরা হাজার চেষ্টা ক'রেও গোপন শর্তের শিকাব খুঁজে বার করতে পারেনি।

আদর্শের দিক দিয়ে তুলাল বামপন্থী। দেশেব সাধারণ মানুষরা যে মৃত্যুর পরেও কয়েক মিনিট বেঁচে থাকবার সুবিধা পাচ্ছে তাতে ওর আনন্দের আর সীমা নেই। এই সম্বন্ধে আড়াই হাজার পৃষ্ঠার একটা বই লিখেছে সে। এখনো রিসার্চ ক'রে যাচ্ছে। রিসার্চ শেষ হ'লে বইটি পাঁচ হাজার পৃষ্ঠায় গিয়ে দাঁড়াবে। এই পাণ্ডু-লিপির খবর পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ প্রকাশকদের কানে গিয়ে পৌছেছে। তার ফলে নতুন ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই-এর তুই অংশের প্রকাশকরাই বই ছাপবার জন্য ক্ষেপে উঠেছে। এক

দিকের প্রকাশক বলছেন, সাড়ে দশ কোটি গ্যারান্টিড সেল্। অন্য দিক বলছেন, গ্যারান্টি দেবো না, তবে বিক্রি হবে অনেক! কোনো সিদ্ধান্ত এখনো গ্রহণ করেনি দুলাল। গজাননবাবু এক লাইনও প'ড়ে উঠতে পারেননি। মাঝে মাঝে দুলাল খুবই পেড়াপেড়ি করে। বলে, "দাদা, এটা না পড়লে আদর্শের মূলে গিয়ে পৌঁছতে পারবে না।"

"আমার বয়স তো কম হ'ল না। আর কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছিস, দুলাল? যাদের বয়স কম, তারা মূলে গিয়ে পৌঁছবার সময় পাবে।" আড়াই হাজার পৃষ্ঠার খবর শুনবার পরেই গজাননবাবু মনে মনে ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন, সাত-তাড়াতাড়িতে বামপন্থী হ'য়ে যাওয়াই মঙ্গল। তাই তিনি বলেছিলেন, "আড়াই হাজারের ঝুঁকি আমায় আর নিতে বলিস্‌নে, দুলু। তোর আদর্শই আমি মেনে নিয়েছি। বই পড়িয়ে পড়িয়ে যদি দল গড়তে যাস, তা হ'লে তুই শতাব্দী পরেও দেখবি, তোর দলের সভ্যসংখ্যা বাড়েনি, শুধু একজনই আছে। তুই একলা।"

বেলা দশটা বাজতেই গজাননবাবু এসে অফিসে ঢুকে পড়লেন। চেয়ারে ব'সে দু'দিকে দু' হাতই ছড়িয়ে দিলেন তিনি। একজন বৈজ্ঞানিক ইনজেক্‌শন দেওয়ার জন্য সিরিঞ্জ্‌ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। গজাননবাবুর বাঁ হাতটা আগে তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। না, এ হাতে আর জায়গা নেই। প্রতিটি রোমকূপে খোঁচাব দাগ। ডান হাতের রোমকূপও প্রায় ফুরিয়ে এলো। একটু ফাঁকা স্থান দেখতে পেয়ে বৈজ্ঞানিক স্থঁচের মুখটা ফুঁড়ে দিলেন সেইখানে। দিয়ে বললেন, "আপনার কাজের প্রেসার আজ কম। সেইজন্য ওষুধের পরিমাণও কম। পাঁচ-ছ' ঘণ্টা পর্যন্ত ক্লান্তি কিংবা শ্রান্তি আসবে না।"

"কাজের প্রেসার কম কেন, বৈজ্ঞানিক?"

"মৃতের সংখ্যা ক্রমশই ক'মে যাচ্ছে তো। সেইজন্য ব্যবসা একটু ডাউনের দিকে।"

"তুমি একবার জেনারেল ম্যানেজারকে ডেকে দাও। মৃতের সংখ্যা ক'মে যাচ্ছে বললেই তো সমস্যা মিটল না। এতোবড় অফিস চালাতে হবে—আমাদের রিসার্চ ডিপার্টমেণ্ট কি কবছে? দরকার হয়, মৃত্যুহার বাড়াতে হবে। বাজেটের ঘাটতি আমি সহ্য করব না। আগে বাজেট, তারপর দেশ এবং দশ। বৈজ্ঞানিক, তুমি কোন্ পন্থী? বাম, না ডান?"

"আজ্ঞে, আমি শুধু বিজ্ঞানপন্থী। বিজ্ঞান ছাড়া আমি অন্যকিছু বুঝি না।"

"কেন? প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা—এসবের সঙ্গে তোমার কারবার নেই?"

"শুধু বিজ্ঞান যতোটুকু অনুমোদন করে।"

"তাব মানে?"

"আজ্ঞে···উৎপাদনের প্রয়োজনে যতোটুকু···"

"ও, বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি যাও।"

বৈজ্ঞানিক চ'লে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলাল এসে ঘরে ঢুকল। টেলিফোন-রিসিভারের ওপব হাত বেখে সে বলল, "গজুদা, শক্তিগড় থেকে খদ্দের এসেছে। তাঁরা ম্যানেজিং ডিরেক্টাবেব সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁদের সবাইকে আসতে বলেছি!"

"সবসুদ্ধ ক'জন?"

"সাত-আট জন হবে।"

"না, দুলাল···ওদেব মধ্যে একজন কি দুজনকে আসতে বলো। সবার সঙ্গে আমি দেখা করব না। একজন খদ্দেরের সঙ্গে এতো লোক কেন?"

"পাড়াগাঁয়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি একজন। প্রায় সত্তব-আশী একর জমির মালিক। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর একটা সিনেমা-হাউস খুলেছেন। লেখাপড়া শেখেননি। চেহারা দেখে তুমি কিন্তু তাঁকে অসম্মান কোরো না। আমাদের ব্যাঙ্কে লাখ-লাখ টাকা

জমছে সে-কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু আদর্শের দিক দিয়ে আমরা সাম্যবাদী। আমাদের কাছে সবাই সমান। তা ছাড়া সম্মান দেখাতে তো আমাদের বাড়তি খরচা হবে না।" পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে চেয়ারের গদি মুছতে লাগল দুলাল। তারপর নিজেই বাইরে গিয়ে সিঁড়ির মুখে জনতাকে আট্‌কে দিল। বললে সে, "আপনারা শুধু দুজন ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি পেয়েছেন। আসুন—আপনি আসুন, নবকেষ্টবাবু। উনি কে? আপনার ছোট ভাই?"

"হ্যাঁ, বটকেষ্ট।"

"তা হ'লে আপনারা দুজন আসুন।"

দুজনেরই গায়ে জামা নেই। খালি-গা। ঘাড়ের ওপরে পাট-করা চাদর। ধুতির প্রান্ত হাঁটুর নিচে নামেনি। অপরিষ্কার এঁরা কেউ নন। অসাবধানতার জন্য চাদর, ধুতি এবং গায়ে থাবা-থাবা কাদা লেগে রয়েছে। বর্ষার সময়, গাঁয়ের মানুষদের গায়ে কাদা লাগা তো স্বাভাবিক। ওঁদের দেখতে পেয়েই গজানন মুখুজ্জে প্রথমেই অকারণে নিজের সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর ফুঁ দিতে লাগলেন। যেন ওঁদের গা থেকে ধুলোমাটি সব এরই মধ্যে ছিট্‌কে এসে নিজের জামার ওপর পড়েছে।

নবকেষ্ট এবং বটকেষ্টকে চেয়ারে বসতে দিয়ে দুলাল জিজ্ঞাসা করল, "বলুন এবার, কে মারা গিয়েছেন আপনাদের।"

"আমাদের মাতাঠাকুরানী।"

"কতো বয়স হয়েছিল তাঁর?

"পঁচানব্বই।"

গজাননবাবু বললেন, "আহা, বড্ড অসময়ে মারা গেলেন তো!"

বাবু নবকেষ্ট পালচৌধুরীর চোখ প্রায় ভিজে উঠল। নিজেকে সংবরণ করতে প্রায় মিনিট দুই সময় লাগল। চাদর দিয়ে চোখ

মুছতে গিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে কাদা লেগে গেল খানিকটা। তিনি বললেন, "কাল তাঁর শ্রাদ্ধ। শক্তিগড়ে আপনারা একটা শোকসভা করুন। দেশের লোকেরা তাঁকে চিনুক।"

ছোট ভাই বটকেষ্ট বলল, "আমরা তাঁর অধম সন্তান। লিখতে পড়তে জানি না। কিন্তু আমাদের গভ্ভধারিণী নবেল পড়তে পারতেন।"

"দুলাল!"—গজাননবাবু দেখলেন দুলাল তন্ময় হ'য়ে গিয়েছে। বার-তিনেক ডাকবার পর তন্ময়তা কাটল তার। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, "দাদা, উনি সত্যিই অসময়ে দেহত্যাগ করলেন! উপযুক্ত পাবলিসিটির অভাবে দেশের লোক তাঁর কাছ থেকে পেলে না কিছুই। আপনারা চিন্তা করবেন না। খুব বড় মিটিং ডাকব। জনতার অভাব বোধ করবেন না। আমাদের কোম্পানির সবাই যাবে। বিরাট জনসভা! সঙ্গে ক'রে শ'-পাঁচেক হ্যাণ্ডবিল নিয়ে যান। শোকসভার জন্য জায়গা পাওয়া যাবে তো শক্তিগড়ে? ময়দান, পার্ক কিংবা মাঠ?"

নবকেষ্টবাবু বললেন, "আজ্ঞে, ময়দান কিংবা পার্ক নেই। মাঠ আছে, কিন্তু তাতে ধান লাগানো। প্রায় এক ফুট ক'রে লম্বা হয়েছে গাছ।"

বটকেষ্ট বললে, "মরার আগে আমাদের গভ্ভধারিণী ব'লে গেছেন, এবার তোদের জমিতে সোনা ফলবে রে।"

গজাননবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে শক্তিগড় কতদূর?"

"এক কদমের পথ নয়—লাগালাগি।" জবাব দিল বটকেষ্ট।

"তা হ'লে ঐ রাস্তার ওপরেই সভা হবে। আপনারা এক কাজ করুন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দু'দিকে অস্থায়ী বেড়া তুলে দিন। দুলাল, পুলিসকে একটা নোটিশ পাঠাও এক্ষুনি। বলো যে, এক ঘণ্টার জন্য শক্তিগড়ের সামনে দিয়ে কোনো গাড়ি-ঘোড়া

যেতে পারবে না কাল। নবকেষ্টবাবু, রাস্তায় বেড়া দেবেন কি দিয়ে?"

বটকেষ্টবাবু বললে, "খালি ক্যানেস্ত্রা বৰ্দ্ধমান শহরে পাওয়া যায়।"

নবকেষ্টবাবু বললেন, "চেষ্টা করলে ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের কাছে বড় বড় পিপেও পাওয়া যেতে পারে। মোটরগাড়ির তেল রাখবার খালি খালি পিপে ওদের কাছে অনেক—"

দুলাল নেচে উঠে বললে, "ফার্স্ট্‌ ক্লাস! এর চেয়ে মজবুত ব্যারিকেডের আর দরকার নেই। ওতেই চলবে। ফী কতো দিয়েছেন, নবকেষ্টবাবু?"

· "আজ্ঞে, সাড়ে সাতশো—"

"ছি ছি, করেছেন কি! অমন একজন বিশ্ববিখ্যাত আদর্শস্থানীয়া জননীর জন্যে ইল্‌শে-গুঁড়ি?"

এইসময় সবাই একসঙ্গে ঘরের পশ্চিমদিকে দৃষ্টি ফেললেন। এতোক্ষণ পর্যন্ত কেউ দেখতে পাননি যে, শোকসভা কোম্পানির কাঁদুনে-ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি এবং তার ডেপুটি বেঞ্চির ওপর পা দুলিয়ে ব'সে আছে। এরাও আবার পারিবারিক জীবনে দুটি আপন ভাই। শুম্ভচরণ এবং নিশুম্ভচরণ প্রামাণিক। কাজে যখন যোগ দেয় এরা তখন বেশ মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস ছিল। এখন প্যাকাটির মতো সরু হ'য়ে গিয়েছে। বছর-পাঁচ থেকে ক্রমাগত প্রতিদিন কাঁদতে হচ্ছে ওদের। জমে না কিছুই, মেদমজ্জা পর্যন্ত গ'লে গ'লে বেরিয়ে যায়। ইল্‌শে-গুঁড়ি কথাটা কানে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ প্রামাণিক ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে উঠল।

গজাননবাবু বললেন, "এই ম'লো যা! তোরা এখানে কি করতে এলি?"

দুলাল বলল, "নমুনা দেখাচ্ছে নবকেষ্টবাবুদের! স্যাম্পেল্‌

দেখে মাল কেনাই ভালো, গজুদা। নবকেষ্টবাবু, কেমন শুনছেন ? মাত্র আড়াইশো টাকার জন্য এমন সুযোগ ছাড়বেন ?"

বটকেষ্ট উৎসাহিত হ'য়ে বললে, "স্বর্গে ব'সে গর্ভধারিণী বড়ই আহ্লাদ করবেন। আড়াইশো টাকা দিয়ে দাও, দাদা।"

ট্যাঁক থেকে টাকা খুলতে খুলতে নবকেষ্টবাবু বললেন, "শক্তি-গড়ের নিমাই সারখেল এসেছেন আমাদের সঙ্গে আপনাদের অফিস দেখতে।"

"তিনি কে ?" জিজ্ঞাসা করলেন গজানন মুখার্জী।

"শক্তিগড়ের ল্যাংচা তো নিমাইবাবুর পিতামহ প্রথম আবিষ্কার করেন। ধনী মানুষ এঁরা। অগাধ পয়সা।"

"তিনি এসেছেন কেন ?"

বটকেষ্ট বললে, "তেনার গর্ভধারিণীও স্বর্গের দিকে যাবেন। ভারি ব্যামো। একশো পাঁচ বছর বয়স। নেমাই মেসো আগুতেই পুরো ফী জমা দিতে চান।"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন গজানন মুখুজ্জে। তিনি বললেন, "আপনারা তা হ'লে এবার আসুন। আমরা পাঁচটায় গিয়ে পৌঁছব। কতোক্ষণ লাগে পৌঁছতে ?"

নবকেষ্টবাবু বললেন, "পনরো মিনিট। আমরা বেশি ভাড়া দিয়ে সুষুম্না-কেন্দ্রিক গাড়িতে চেপে এলুম।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গজাননবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এ কোন্ ভাষার ট্রেন, দুলাল ?"

"আগে এর নাম ছিল পারমাণবিক ট্রেন। ব্যাপারটা একই। ভাষার একটু হেরফের হয়েছে।"

নমস্কার ক'রে নবকেষ্টবাবু ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বেঞ্চিতে ব'সে শুম্ভ-নিশুম্ভ আবার কেঁদে উঠল। গজানন মুখুজ্জে গর্জে উঠলেন, "চুপ কর্— হ'ল কি তোদের ?"

দুলাল বলল, "মানুষ তো অভ্যাসের দাস। তাই যখন-তখন কেঁদে ওঠে ওরা।"

"বকিস্‌নে, দুলাল। দিনরাত্তির কান্না শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেল। এরা শুরু করতে জানে, থামতে জানে না। স্বর্গের দেবতাদের তো ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিস—বল্, কি চাস তোরা ?"

শুভ্র প্রামাণিক এগিয়ে এসে বলল, "বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে বললেন, আরো প্রোটিন, ভাইটামিন, আয়োডিন আর ফ্যাট খেতে হবে আমাদের। নইলে শোকসভা কোম্পানির কাঁদুনে-ডিপার্টমেণ্টের কেউ বাঁচবে না।"

"ভালোই তো। বিনা ফী-তে তোদের শোকসভা করব আমরা। আমার কি করতে হবে তাই বল্।"

"হুজুর, আমাদেব মাইনে বাড়াতে হবে।"

"সর্বনাশ! দুলাল, অফিসে কি ইউনিয়ান আছে নাকি ?"

"সবে হ'ল, দাদা।" বলল দুলাল।

"কে করল ?"

"আমি।"

"সভাপতি কে ইউনিয়নেব ?"

"আমি, গজুদা।"

"তোর বামপন্থী ঢং আর ভালো লাগে না, দুলাল। বই লেখাই তো ভালো ছিল, এমন রামবাজ্যে আবার ইউনিয়ানের ঝামেলা সৃষ্টি করতে গেলি কেন ? যাক্, ভাই দুটিকে ব'লে দে, এবার পাঁচ টাকা ক'রে বাড়াচ্ছি—আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আর একটি পয়সাও বাড়বে না।"

প্রামাণিক ভাই-দুজন কাঁদতে কাঁদতে এবং নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বেলা দুটো বেজে গেল, দুলাল তবু খেতে আসছে না। এর

মধ্যে বার-পাঁচেক লোক পাঠিয়েছে পট্‌লী। তাতেও কাজ হ'ল না। লোকটা কি জেনারেল ম্যানেজার, না উন্মাদ? মাসের মধ্যে পনরো দিনই অফিস-কামরায় খাবার পাঠিয়ে দিতে হয়। এতো কী কাজ করেন দুলালবাবু? খাবার না পাঠিয়ে পট্‌লী নিজেই চ'লে এলো দুলালের অফিসে। সে দেখল, টেবিলের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে দুলালবাবু তন্ময় হ'য়ে কি যেন লিখছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার কি ক্ষিধে পায় না, দুলালবাবু? দেশে কি আপনি একাই শুধু জেনারেল ম্যানেজার?"

"পাটুল দেবী, এ বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ! পঁচানব্বই বছরের মৃতাকে এক ঘণ্টার জন্য বাঁচিয়ে তুলতে হবে। স্বর্গীয়া সুধাময়ী পালচৌধুরীর জীবনী লেখা এইমাত্র শেষ হ'ল। কী অদ্ভুত জীবনী! চরিত্র মাত্র একটি, কিন্তু তাতে গুণের সমাবেশ হয়েছে পঁয়ত্রিশটা। আজ আমায় রামকমল সেনের অভিধান খুলতে হয়েছিল। এতো-গুলো গুণ আধুনিক অভিধানে খুঁজে পেলুম না আমি।"

"বানিয়ে বানিয়ে মরা মানুষের চরিত্রে গুণের সৃষ্টি করেন আপনি। প্রত্যেকদিন খবরের কাগজে তাই ছাপা হয়। আজকাল আর কেউ বিশ্বাস করে না। কাল দেখলুম, মানিকতলার বিখ্যাত কালোয়ার দেবীদয়ালের বৌকে মনীষী বলেছেন আপনারা!"

"কেন বলব না? দু' হাজার টাকা স্পেশাল ফী দিয়ে দেবীদয়াল শোকসভা ডেকেছিল।"

"মৃত্যুর পরেও দেবীদয়ালের বৌ মনীষী কথাটার অর্থ বুঝতে পারবে না। কী লাভ ও-সব বড় বড় কথা লিখে? বেচারী স্বর্গে গিয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না। ভাবছে, অসাধু স্বামী বুঝি তাকে গালাগাল দিচ্ছে। চলুন, এবার খেতে চলুন।"

উঠে পড়ল দুলাল। এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিল, বড়সাহেব এক্ষুনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। বিরাট বড় একজন খদ্দের এসেছেন। জম্বুদ্বীপের ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

দুলালের মুখে অসহায়তার হাসি! বড়সাহেবের কামরার দিকে হাঁটতে হাঁটতে দুলাল বলল, "একটু ভালবাসবার পর্যন্ত অবসর নেই! পাটুল, পারবে আমায় ক্ষমা করতে?"

"আপনার সঙ্গে আমার ভালবাসার সম্পর্ক নাকি?"

"তবে? এতোবড় সৌধ তা হ'লে খাড়া করলুম্ কিসের ওপর? অভিমান কোরো না পাটুল, টেবিলে খাবার সাজাতে বলো, আমি এক্ষুনি আসছি। তুমি আমার পাশে বসবে, পাতলা মসুরডাল দিয়ে আমি চাট্টি গরম-গরম ভাত খাব। তারপর তোমাতে আমাতে শুধু মধুর গুঞ্জন—"

"দাঁড়ান, বাবাকে আমি ব'লে দেব। আমার নিষ্কলঙ্কতা নষ্ট করবার জন্য আপনি কবিতা লিখছেন। আমি এখানে থাকব না, জনার্দনপুরে চ'লে যাব। ছিঃ দুলালবাবু! আপনার চেয়ে মদ্‌নাও উঁচুস্তরের জীব। মদ্‌না মানুষ হ'লে আমি তাকে বিয়ে করতাম, জানেন?"

"জানি পাটুল, জানি। বয়স বাড়ছে মদনের। আমি নিজেই বলব গজুদাকে—"

"কি বলবেন?"

"তোমার বিয়ের কথা।"

"কার সঙ্গে?"

"আমার সঙ্গে।"

"সত্যি, দুলুদা?"

"সত্যি। মদনভস্মের আগেই তোমার ভেতরটা আমি দেখলাম, পাটুল।"

পট্‌লী হেলতে-দুলতে নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে এল দুলালের কাছে। এসে জিজ্ঞাসা করল, "বলো-না দুলুদা, ভেতরে আমার কি দেখলে?"

"গ্র্যাণ্ড।"

দরজা ঠেলে দুলালের অফিস-কামরায় ঢুকে পড়লেন গজানন মুখুজ্জে।

সুষুম্না-কেন্দ্রিক গাড়িতে চেপে সময়মতো শক্তিগড় এসে পৌঁছলেন সবাই। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দু'দিক থেকেই বন্ধ করা হয়েছে। শ'-দুই লোকের ভিড় দেখলেন গজাননবাবু। সংবাদ-পত্রের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁর পাশেই ব'সে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওহে বাঁটুল চৌধুরী, স্বর্গীয়া মনীষী সুধাময়ী দেবীর শোকসভায় কতো লোক দেখছ?"

বাঁটুল চৌধুরী দূরের মানুষ দেখবার চশমাটা পকেট থেকে বার করল। পুরু কাঁচের চশমা পরে বিশেষ প্রতিনিধি। দেখতে ভুল হ'য়ে গেলেই সর্বনাশ হবে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের চারদিকটা নিবিড়ভাবে দেখে নিয়ে বাঁটুল চৌধুরী বলল, "শ'-দুই তো হবে। পাড়াগাঁয়ের পক্ষে জনতা কিন্তু কম নয়, দাদা।"

"তোমার খবরের কাগজে ছাপা হবে কতো?"

"দু' হাজার। শূন্য আর বাড়াতে বোলো না, দাদা—মালিক রাগ করবেন।"

গজানন মুখার্জী যথারীতি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। প্রধান বক্তা দুলাল দত্ত। বাবু নবকেষ্ট পালচৌধুরী মশাই বসলেন সভাপতির পাশে। কোম্পানির কাঁদুনে-বিভাগটি জনতার মধ্যে মিশে গিয়েছে। সেক্রেটারি আর তার ডেপুটি রুমাল হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, মঞ্চের ওপর থেকে কখন তাদের কাঁদবার জন্য ইশারা করবে দুলাল। বক্তৃতা শুরু হ'ল। মাইকের কাছে মুখ রেখে দুলাল বক্তৃতা দিতে লাগল: শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ! স্বদেশের ইতিহাস-আকাশ থেকে আরও একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কা খ'সে পড়লেন! বৈদিক যুগের বিদুষী ঋষিকন্যা গার্গীর মতো স্বর্গীয়া

সুধাময়ী পালচৌধুরীও একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। প্রাচীন ভারতেব ব্রহ্মবাদিনী গার্গী বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রমাণ দিয়েছিলেন তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আধুনিক ভারতবর্ষের শক্তিগড়ে যে স্বর্গীয়া সুধাময়ী নীরবে, নিভৃতে এবং নিশ্চিন্ত মনে নানাবিধ বিদ্যাচর্চায় পঁচানব্বইটা বছর কাটিয়ে গেলেন তা আপনারা অবশ্যই জানেন না। বাবু বটকেষ্ট পালচৌধুরী মহাশয়ের যুক্তি-প্রমাণ অখণ্ডনীয়। আজ পঁচানব্বই বৎসর পর তাঁর কাছ থেকে প্রথম আমরা জানতে পাবলাম, বিদুষী সুধাময়ী বাংলা নভেল পড়তে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হ'ল। শক্তিগড় সাধারণ পাঠাগারের মেম্বার ছিলেন তিনি। এই সর্বনাশা ক্ষতি পূরণ হবে কেমন ক'বে? দানে, ধ্যানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং রূপে গুণে সুধাময়ীর মতো দ্বিতীয়া নারীর সন্ধান পাওয়া অসম্ভব।—এই সেরেছে! গজুদা, শুম্ভ-নিশুম্ভ আগেই কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। এখনো যে আসল জীবনীতে প্রবেশ করতে পারিনি—"

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপব ব'সে পুরো সভাটি কাঁদতে আবম্ভ কবল। চলাচলের পথ বন্ধ ব'লে দু'দিকেই গাড়ি জমে গিয়েছিল অনেক। শোকসভার কান্না শুনে গাড়িওয়ালারা সবাই একসঙ্গে হর্ন বাজাতে লাগল। বটকেষ্ট লাফিয়ে উঠে পড়ল মঞ্চের ওপর। নবকেষ্টবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ফিসফিস ক'রে বলতে লাগল, "দাদা, সভা বন্ধ ক'রে দাও। যত্‌টা হয়েছে, তাই থাক।"

"কেন রে?" অবাক হ'য়ে গেলেন নবকেষ্টবাবু।

"নেমাই সারখেল রেগে গিয়েছেন। বলছেন, 'শক্তিগড়ের ল্যাংচা আর কেউ কিনবে না। তোর গভ্‌ভধারিণী সংসারের য্যাতো গুণ আছে সব সঙ্গে নিয়ে স্বগ্‌গে গিয়েছেন, ল্যাংচার জন্য একটি গুণও রেখে যাননি।' বন্ধ ক'রে দাও, দাদা। নেমাই সারখেলকে রেগানো যাবে না। জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে লড়বে কি ক'রে?"

"না, লড়া অসম্ভব হবে।" বললেন নবকেষ্টবাবু। তাঁর অনুরোধ অনুসারে সভাপতিমশাই নিজের সংক্ষিপ্ত ভাষণটুকু নিবেদন ক'রে দিলেন। জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। নবকেষ্টবাবু অতিথিদের নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন বটকেষ্ট গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বেড়া ভাঙছিল। পেট্রলের বড় বড় খালি ড্রাম সব আজকেই বর্ধমানে ছেলেদের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। কেরোসিন তেলের কেনেস্তার সংখ্যাও কম নয়।

দুলাল কিন্তু ল্যাংচার ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করেনি। নিমাই সারখেল পুঁজিবাদী। গোপন মতলব না থাকলে এরা এক পা-ও এগোয় না। এতোবড় একটা শোকসভা শুরু হ'তে-না-হ'তেই শেষ করিয়ে দিল নিমাই সারখেল! জলযোগের প্যাণ্ডেলে ঢুকে তাকে খুঁজতে লাগল দুলাল।

খোঁজবার দরকার হ'ল না। মুখুজ্জেমশাই ইতিমধ্যে নিমাই সারখেলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে ভেতরের ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছেন। খেতে বসে তিনি বললেন, "বুঝলি দুলাল, ল্যাংচা-ফ্যাংচা কিছু না। সাইকোলজি।"

"সাইকোলজি?"

"হ্যাঁ। নিমাই সারখেলের অবচেতন মনে তার নিজের মায়ের কথাটা ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। সুধাময়ীর ওপর সবগুলো বিশেষণ যখন তুই চাপিয়ে দিচ্ছিলি, তখন সে ভাবল, তার মায়ের জন্য কিছুই আর রইল না। বেচারী! বাংলা-ভাষায় যে হাজার-হাজার নতুন বিশেষণ তৈরি হয়েছে তা আর সে কেমন করে জানবে বল্? এই গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপরেই তো আবার আমাদের আসতে হবে শোকসভা করতে।"

"শক্তিগড়ের সবাই দেখছি সাংঘাতিক মাতৃভক্ত!"

"সাইকোলজি দেখে তো তাই মনে হচ্ছে।"

"আগাম দিল নাকি?"

"পাঁচশো। নিমাই সারখেল অ্যাডভান্স-বুকিং করলে। তোর খাটুনি কমলো, দুলাল। বক্তৃতার বাকী অংশটা কাজে লাগাতে পারবি। শুধু গার্গী কথাটা তুলে দিস। প্রাচীন ভারতবর্ষে বিদুষী নারীর অভাব ছিল না।"

এক গেলাস জল খেয়ে দুলাল বলল, "আমি আগেই জানতুম, ল্যাংচা-ফ্যাংচা কিছু না। ধাপ্পা মারছে।"

"ধাপ্পা নয়, দুলাল! এ হচ্ছে প্রতীকের সাহায্যে মনের কথা ব্যক্ত করার শিল্প। আর্ট। নিমাই সাবখেলের অবচেতন মনটিতে প্রবেশ করলে দেখতে পাবি, সেখানে অন্য কোনো প্রতীক নেই, শুধু ল্যাংচা-প্রতীক। আজকে একটা স্পেশাল সাইজ তৈরি করেছে বে! মাদলের মতো দেখতে।"

"জানি, মাদুলিব মতো দেখতে হ'লে তুমি স্পর্শ কবতে না, গজুদা। কতোটা সঙ্গে নিচ্ছ?"

"গুনে দেখিনি। গোটা-তিন হাঁড়ি তো সাবকেল স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে। দাম দিতে গেলুম, লজ্জা পেয়ে ঘাড় নেড়ে হাতটা সবিয়ে দিলে। এবাব আর দেরি নয়, চল্ স্টেশনে যাওয়া যাক। তাড়াতাড়ি ফেবা দরকার। জম্বুদ্বীপেব ম্যানেজিং ডিবেক্টার অপেক্ষা করছেন। আজ রাত্রির মধ্যেই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা সব পাকা ক'রে ফেলতে হবে।"

॥ দুই ॥

জম্বুদ্বীপের ম্যানেজিং ডিরেক্টার বাবু প্রহস্তনারায়ণ দাস মহাশয় সমস্তটা দিন মহানগরীর যাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে দেখে সময় নষ্ট করলেন। রাত্রি সাতটার আগে গজানন মুখার্জীর সঙ্গে পাকা কথা কিছু হবে না। তিনি ব্যস্ত। সাতটা পনরো মিনিটে প্রহস্তনারায়ণের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা কববেন গজাননবাবু।

ছুলালও উপস্থিত থাকবে। অতিথিকে আপ্যায়ন করবার ব্যবস্থা করেছিল পটলী। কিন্তু প্রহস্তনারায়ণ বললেন যে, এই মহানগরীর খাদ্য তিনি স্পর্শ করবেন না। জম্বুদ্বীপ থেকে তিনি সুষুম্না-কেন্দ্রিক টিফিন-ক্যারিয়ার নিয়ে এসেছেন। তাতে প্রায় দিন-সাতেকের খাদ্য মজুত আছে। টিফিন-ক্যারিয়ারটি দেখে শোকসভা কোম্পানির (প্রাইভেট লিমিটেড) সবাই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছেন। সুইচ টিপে দিলে নিজে থেকেই খাদ্য প্রস্তুত হ'য়ে যায়। থালা কিংবা প্লেটে সাজাবার দরকার হয় না। নিজে থেকেই সেজেগুজে খাদ্য সব বেরিয়ে আসে। খাদকদের শুধু কষ্ট ক'রে খেতে হয়। এই টিফিন-ক্যারিয়ারটি দেখবার পর মুখুজ্জেমশাই শুধু ভাবছেন, দুই শত বৎসরের চেষ্টার পরেও মহানগবীর সভ্যতা এক পা-ও এগুতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির ওপর দু' হাজার পাতার বই লিখলেও এমন কলঙ্ক ঘোচবার নয়! মাটির তলা থেকে হাঁড়ি-কলসী খুঁড়ে খুঁড়ে যাঁরা বার করছেন তাঁরা কী যে প্রমাণ করতে চান বুঝতে পারেন না গজাননবাবু। জম্বুদ্বীপের নাগরিকরা যখন সুষুম্না-কেন্দ্রিক টিফিন-ক্যারিয়ার ব্যবহাব করছেন, আমরা তখনো মাটি খোঁড়ার কাজ নিয়ে ব্যস্ত! প্রাচীন মাটিতে আর কিছু নেই, ভাই, এবাব আকাশ খোঁড়বার চেষ্টা করুন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অজুহাতে চাকবি-বাকরি সবার ঠিক থাকছে বটে, কিন্তু এদিকে যে বিংশ শতাব্দীটা প্রায় শেষ হ'য়ে এল। শতাব্দীব রঙ্গমঞ্চে আশার অঙ্গারও যে পুড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে। আর কতো রজনী চলবে দাদা? ··নানারকম প্রশ্নবাণে আজ সমস্তটা দিন ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন গজাননবাবু।

মহানগরীতে সত্যিই কিছু দেখবার ছিল না। যা কিছু দেখছেন প্রহস্তনারায়ণ, সবই মনে হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতার ধ্বংসাবশেষ। নগরীর পূর্বসীমান্তে যে নিমক-হ্রদটি দেখে এলেন তাতেও কোনো আধুনিকতার চিহ্ন নেই। চতুর্দিকে শুধু ব্যবসার দুর্গন্ধ। দেড়

কাঠা জমির ওপর দেড়শো তলা গৃহ-নির্মাণের প্ল্যান ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পেলেন না তিনি। শ্রান্ত এবং ক্লান্ত হ'য়ে শোকসভা কোম্পানির অফিসে ফিরে এলেন প্রহস্তনারায়ণ দাস।

সাতটা বেজে গিয়েছে। সাতটা চোদ্দ মিনিটে তুলাল নিজেই তাঁকে সসম্মানে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরে নিয়ে এল। দেওয়ালে-টাঙানো বিরাট একটা পৃথিবীর মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে জম্বুদ্বীপের অবস্থানটা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছিলেন গজানন মুখুজ্জে। সওয়া সাতটা এখনো বাজেনি। আরও এক মিনিট সময় আছে। মানচিত্রের সঙ্গে চশমা ঠেকিয়ে আরও একটু ঝুঁকে দাঁড়ালেন তিনি।, কথা বললেন না। মনে মনে প্রহস্তনারায়ণের নামটা বার বার ক'রে আওড়াতে লাগলেন। প্রতিবারই 'প্র' অক্ষরটা ঠোঁটের ভেতর দিকে আটকে যাচ্ছে। ঠিক সওয়া-সাতটায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, 'প্র' অক্ষবটা বাদই দিতে হবে। যদি কদর্থ-সূচক না হয়, তা হ'লে হস্তনারায়ণ ব'লেই সম্বোধন করবেন তাঁকে।

ঘড়ির দিকে শেষবারের মতো দৃষ্টি দিয়ে গজাননবাবু সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন, "আসুন। আমাদের সৌভাগ্য, আপনার মতো মহামান্য ব্যক্তির পায়ের ধুলো পড়েছে এই গরীবখানায়। দেখুন, আপনাকে আমি হস্তনারায়ণ ব'লেই ডাকব। আশা করি আপনার তাতে কোনো অসুবিধে হবে না ?"

"আপনার সুবিধে হ'লেই হ'ল।"

"বাঃ, বেশ! আপনার মতো মহাশয় ব্যক্তির মুখে এই তো যোগ্য উত্তর। দেখুন হস্তনারায়ণবাবু, জম্বুদ্বীপেব দ্রাঘিমা এবং লঘিমা কতো ?"

"দ্রাঘিমা-লঘিমা দিয়ে জম্বুদ্বীপের অবস্থান বার করতে পারবেন না।"

"তবে!" ঘাবড়ে গিয়েছেন গজাননবাবু। তুলালও খুব সুস্থির চিত্তে ব'সে নেই।

প্রহস্তনারায়ণ বললেন, “জম্বুদ্বীপেব অবস্থান ঊর্ধ্বগগনে। এখান থেকে সাড়ে বাইশ হাজার মাইল।”

“বাঃ বেশ, ভালো জায়গা তো! কেমন ক’রে এলেন এখানে?”

“আমার একটি রকেট-জাহাজ আছে।”

“কতোক্ষণ লাগল পৌঁছতে?”

“পঁয়তাল্লিশ মিনিট। আমাবটা লেটেস্ট মডেলেব। স্বয়ংক্রিয়। ড্রাইভাবের দবকাব হয় না।”

খবর শুনে দুলাল মুখ নিচু ক’বে ব’সে বইল। উঁচু মাথা ওব হেঁট হ’য়ে গিয়েছে। মহানগবীব রাস্তায় এখনো দু’একটা ধীবগামী ঘোড়াব-গাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। মোটবগাড়ি আজও পেট্রল ছাড়া চলে না। এব জন্য অবিশ্যি মুনাফাখোব বিদেশী তৈল কোম্পানিগুলোই দায়ী। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র বয়েছে এব পেছনে। ছি ছি. কী সাংঘাতিক পিছিয়ে পড়েছে দেশটা! উন্নতি যা একটু দেখা যাচ্ছে তা শুধু মহানগবীব মাথাব ওপবে। গোটাকযেক হেলিকপ্‌টাব কেবল ফড়িং-এব মতো ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ ক’বে উড়ে বেড়ায়। রাস্তাঘাটেব অবস্থা অত্যন্ত খাবাপ। এমন একটি প্রগ্রেসিভ বাষ্ট্রেব ম্যানেজিং ডিবেক্টাবকে মহানগবীব বাস্তায় ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। গজুদা ভীষণ ভুল কবেছেন। কী দবকাব ছিল আজ শক্তিগড়ে যাওয়াব? শোকসভা একদিন পবে হ’লেও স্বর্গীয়া সুখময়ীর নাম দেশেব ইতিহাস থেকে লোপ পেয়ে যেত না। তিনি মনীষী, আজ হোক কাল হোক, শোকসভা কোম্পানি তাঁকে অমবতা দান কবতে পাবতই। এতোগুলো খবরের কাগজ রয়েছে হাতে, ভয়টা কিসেব? গজুদা বোধহয় প্রহস্তবাবুকে প্রথমদর্শনে চিনতে পাবেননি। ভেবেছিলেন, সাধাবণ একটা পাড়াগাঁয়ের মতো ছোট্ট বাষ্ট্রেব ম্যানেজিং ডিরেক্টাব বুঝি। গজুদাকেও দোষ দেওয়া যায় না। বিগত পাঁচ বছবেব মধ্যে শত শত রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। খববের কাগজ খুললেই দু’একটা নতুন

রাষ্ট্র চোখে পড়ে। অনেক সময় বিশ্বাস হয় না। সন্দেহ আসে মনে, খবরের অভাব ঘটলেই বুঝি কাগজ-ওয়ালারা তাদের রোটারী মেশিনে ঠেলা মেরে মেরে নিজেরাই রাষ্ট্র তৈরি ক'রে চলেছে। গজুদার দোষ নেই। চতুর্দিকে মোফত্‌লাল আর দেবীদয়াল কালোয়ারদেব রাজত্ব। কাগজের খবর প'ড়েও কিছু বোঝা যায় না। সম্পাদকদের যুগ আর নেই। এখন শুধু মালিক আর মোসাহেবদের প্রতিভায় ভারতবর্ষের রোটারী মেশিন চলছে। দুঃখে এবং অনুশোচনায় দুলালের মন ভেঙে পড়বার উপক্রম হ'ল।

জম্বুদ্বীপের সঠিক অবস্থান জানবাব পর গজাননবাবু নিজেকে শুধু ভৎসনা ক'রে চলেছেন। এমন একজন মানুষকে দেখেই তো তাঁর চেনা উচিত ছিল! দুলালই বা করল কি? তারই বা ভুল হ'ল কি ক'রে? দুলালের মতো বিশেষজ্ঞ পর্যন্ত আজও মানুষ চিনতে পারে না! এমন মানুষের নাম থেকে বিন্দুবিসর্গও ছাটা চলবে না। হস্তের আগে প্র অক্ষরটা জুড়ে দিয়ে নিজের মনে পুরো নামটা আওড়াতে লাগলেন গজাননবাবু। মিনিট দুই অভ্যাসের পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্র···হস্তনারায়ণবাবু, আপ্যায়ন করবার কোনো ব্যবস্থাই তো করতে পারলুম না। এ-দুঃখ সারা-জীবনেও ভুলতে পারব না। এক পেয়ালা চা অন্তত আনতে বলি? ভারতবর্ষের সবচেয়ে উঁচু এবং উৎকৃষ্ট বাগানের চা—খাবেন না?"

"না, ধন্যবাদ। দুঃখ করবার কিছু নেই। আপনাদের মহানগরীর বিধিব্যবস্থা সব অবৈজ্ঞানিক। আমি রিস্ক্ নিতে পারি না। সাড়ে বাইশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। এক কাজ করুন। আমার টিফিন-ক্যারিয়ারে নল লাগানো আছে। কাউকে বলুন বত্রিশ নম্বর সুইচটা টিপে দিতে, তৈরী চা বেরিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে পাশের খাঁজে চারখানা ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুটও তৈরি থাকবে বাইরে বেরিয়ে আসবার জন্য। কাছে ব'সে খেতে পারলেই

ভালো হ'ত। শুনেছি, মহানগরীর হাওয়া পর্যন্ত দূষিত। যাক্‌গে, এবার কাজের কথাটা বলি।"

"যে আজ্ঞে—" গজানন মুখুজ্জে হাতজোড় ক'রে বসলেন। রক্তের অভ্যাস সহজে মরে না। অতো বড় একজন ভেটারেন বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও বিখ্যাত মানুষ দেখলেই মাথাটা নিচু হ'য়ে আসে, হাতের পাঞ্জায় ঝুলতে থাকে ভিক্ষার পাত্র। দুলাল আবার পটলীর কাছে গল্প করেছে—'তোমার বাবাও আজকাল সাম্যবাদী।'

'পাগল আর কাকে বলে!' মন্তব্য করেছিল পটলী, 'বাবাকে আপনি চেনেন না।'

'তোমার চেয়ে বেশি চিনি। একসঙ্গে আন্দামানে ছিলুম। জন্মের পরে তো বাবাকে তুমি দেখোইনি।'

'না দেখলে কি হবে, আমি জন্মেছি বাবার ঔরসে।'

'তা ঠিক।' দুলাল পরাজয় স্বীকার করেছিল।

কাজের কথাটা বললেন প্রহস্তনারায়ণ। জম্বুদ্বীপের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। যে-ক'জন ডিরেক্টার আছেন তাঁরা সবাই বৃদ্ধ। জম্বুদ্বীপের উৎপন্ন দ্রব্যের বিলি ও ভোগের অধিকার ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। প্রায় এক শতাব্দী আগে সমাজতন্ত্র চালু করেছিলেন প্রহস্তনারায়ণের পিতা। বর্তমানে প্রতিটি মানুষ তার চাহিদা অনুযায়ী ভোগের অধিকারী হয়েছে। জম্বুদ্বীপ একটি অসমান্তরাল বাহুবিশিষ্ট চতুর্ভুর্জ। ট্র্যাপিজিয়াম। কমলালেবুর ন্যায় গোলাকৃতি নয়। শুধু সমাজ-তান্ত্রিক দেশ বললেই সবটুকু বলা হ'ল না। চতুর্ভুর্জটি বাসুকি-বিজ্ঞানের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মানুষের ধ্যান-ধারণার বিষয়বস্তু হ'ল শুধু বিজ্ঞান। এমন প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও শাসনব্যবস্থা অচল হ'য়ে এসেছে। ফলে, জম্বুদ্বীপে একটি বিপ্লবী দলের সৃষ্টি হয়েছে। সদানন্দ ভট্চাজ নামে এক যুবক সেই

বিপ্লবীদলের নেতা। প্রহস্তনারায়ণ এসেছেন শোকসভা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও জেনারেল ম্যানেজারকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গজানন মুখুজ্জে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ?"

"বোর্ড অব ডিরেক্টার প্রস্তাব পাস করেছেন, জম্বুদ্বীপের শাসন-ভার এক বৎসরের জন্য আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। পয়সা-কড়ি আপনাদের কিছু দিতে হবে না।"

তুলালের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। সে বলল, "দাম না দিয়ে পরদ্রব্য আমরা নিতে যাব কেন ? আমাদের কি টাকার অভাব ?"

প্রহস্তনারায়ণ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, "ভারতবর্ষের টাকা জম্বুদ্বীপে লিগেল্ টেণ্ডার নয়। আইনতঃ-গ্রাহ্য মুদ্রা যদি না হয় তা হ'লে কেউ তা ছুঁতে চাইবে না। তা ছাড়া আমাদের দেশে কাগজ কিংবা রুপোর চল নেই। সবই সোনার তৈরী মুদ্রা। আপনারা যে-কাগজের টুকরোটিকে দশ টাকা ব'লে বিক্রি করছেন তার মূল্য আমাদের কাছে এক আনাও নয়। দাম দেবেন কি দিয়ে ? আপনাদের ভাণ্ডারে কতোটুকু সোনা আছে ? ঝকমক করলেই তো তাকে সোনা বলা যায় না।"

গজাননবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "পৃথিবীতে কতো প্রতিভাবান লোক থাকতে আমাদের মতো তুটি সাধারণ মানুষের হাতে দায়িত্ব দিতে চাইছেন কেন ?"

"যাঁদের মাথা থেকে শোকসভা কোম্পানির প্রস্‌পেক্‌টাস বেরুতে পারে তাঁরা অসাধারণ মানুষ। সাড়ে বাইশ হাজার মাইল উর্ধ্বে আমরা বাস করলেও, ভারতবর্ষের কোটি কোটি পিপীলিকার কার্য-কলাপ সবই দেখতে পাই।"

"একদা আমার বিশ্বাস ছিল, অতো ওপরে শুধু ভগবান বাস করেন!" বললেন মুখুজ্জেমশাই।

"আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহরা ওপরে ব'সে ভাবতেন অতো তলায় শুধু ভগবান ছাড়া আর কেউ থাকেন না। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখলুম, ভগবান নন—ভারতবর্ষ। স্বচক্ষে না দেখলে কু-সংস্কারের মেঘ কখনো দূর হ'ত না। এমন অপরিষ্কার এবং দূষিত বায়ু টেনে টেনে ভগবানের পক্ষেও বেঁচে থাকা অসম্ভব হ'ত। আপনাদের করপোরেশনের অট্টালিকাটাও দেখলুম আজ। কোনো মহানগরীর বুকের ওপর যে অতো বড় একটা দগ্‌দগে ঘা জন্মাতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হ'ত। তা হ'লে আমাব প্রস্তাব আপনারা গ্রহণ করলেন তো ?"

"তু'একটা দিন ভাববার সময় দিন।" অনুরোধ কবলেন গজানন মুখুজ্জে।

প্রহস্তনারায়ণ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আস্থন, করমর্দন কবি আমরা। চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। আপনাদের কাছে যা তু'একটা দিন, আমাদের কাছে তা তু'এক যুগের সামিল। কাল সকালেই আমরা বওনা হব।"

"বলেন কি ! জিনিসপত্র গুছোবার সময় দেবেন না ?" জিজ্ঞাসা করল তুলাল।

"একটা আল্‌পিন পর্যন্ত নেওয়ার দরকার নেই। জম্বুদ্বীপের রকেট-বন্দরে কড়া পাহাবা। জলবায়ু দূষিত হ'য়ে যেতে পাবে ভেবে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছি আমরা। জামা-কাপড়ও নিতে পারবেন না।"

"সেকি মশাই ! উলঙ্গ ক'রে নিয়ে যাবেন নাকি আমাদের ? আমরা কি মন্‌কি ? বাঁদর ? না, জানোয়ার ?" তেড়ে উঠলেন গজানন।

"আমি সঙ্গে ক'রে জামা-কাপড় নিয়ে এসেছি। রকেট-বন্দবে নেমে একবারটি শুধু লেবরেটরিতে প্রবেশ করতে হবে। বৈজ্ঞানিকরা আছেন। তাঁরা শুধু রোমকূপগুলো ঝেড়েপুঁছে দোষমুক্ত করতে মিনিট-পাঁচেক সময় নেবেন।"

মুষড়ে পড়ল দুলাল। জম্বুদ্বীপে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল, অথচ মনে মনে ভয়ও পাচ্ছে খুব। ফিরে আসবার জন্য মন যদি হঠাৎ উচাটন হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে এঁদের রকেট-জাহাজের ওপর নির্ভর করতে হবে। নিজেদের তো শুধু একটি হেলিকপ্‌টার সম্বল! তাও তো অতো ওপরে উঠতে পারে না। জম্বুদ্বীপ থেকে লাফিয়ে পড়বারও উপায় নেই। এ বাবা হাজারীবাগ জেলের পাঁচিল-টপকানো নয়! সাড়ে বাইশ হাজার মাইল তলায় এসে পৌঁছতে হবে।

গজাননবাবু বললেন, "পট্‌লীকে ডেকে নিয়ে আয়, দুলু। সেও শুনুক সব। পট্‌লী যদি না যেতে চায় তা হ'লে তো এই প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করতে পারব না।"

দরজার ও-পাশে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনেছে পট্‌লী। সুষুম্না-কেন্দ্রিক টিফিন-ক্যারিয়ারটা দেখবার পর থেকেই প্রহস্তনারায়ণের সম্বন্ধে ওর কৌতূহল বেড়েছে খুব। রান্নাবান্নার ঝামেলা থেকে মেয়েদের এমনভাবে মুক্ত করতে ভারতবর্ষের কেউ পারেননি। কতোরকম নারী-আন্দোলনের খবর রাখে পট্‌লী। কিন্তু আন্দোলন ছাড়াই এই ভদ্রলোকটি নারীজাতির যা উপকার করলেন তার তুলনা মেলা ভার। টিফিন-ক্যারিয়ারটা ভদ্রলোক যদি ফেরত চান তা হ'লে সে বলবে—"ওটা আমরা রেখে দিলুম। দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আমি দেখিয়ে আসব।" এই কথাটি বলবার জন্যই পট্‌লী এসেছিল অফিস-কামরার দিকে। তারপর জম্বুদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার চতুর্ভুজী আকারের কথা শুনতে পেয়ে পর্দার ও-পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

এবার সে অফিসে ঢুকে প'ড়ে বলল, "আমার তো যাওয়ার ইচ্ছা ষোলো আনা। একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তা ছাড়া আমার শরীরের যা অবস্থা, তাতে বেশ কিছুদিন একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় গিয়ে থাকা উচিত, বাবা।"

"তা হ'লে কাল সকালেই আমরা রওনা হব, প্রহস্তনারায়ণ-বাবু।" বললেন গজানন মুখুজ্জে।

"খুবই সুখের এবং আশার কথা। আমি তা হ'লে জম্বুদ্বীপের প্রতিরক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টারকে খবর পাঠিয়ে দিই।" প্রহস্তনারায়ণ পকেট থেকে একটা যন্ত্র বার করলেন। দেখতে ঠিক টাইমপিস্ ঘড়ির মতন। কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি মুখের কাছে যন্ত্রটি তুলে এনে বার্তা প্রেরণ করতে লাগলেন।

এক নতুন প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে উঠল দুলাল। দেশশাসনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লব নেই, কোথা থেকে এক ভদ্রলোক রকেট-জাহাজে চেপে চ'লে এসেছেন শোকসভা কোম্পানির অফিসে। শাসনভার নেওয়ার জন্যে খোশামোদ করছেন তিনি। অভাবনীয় ব্যাপার! পাড়ার লোকেরা বিশ্বাস করতে চাইবে না, দেশের লোকেরা বলবে : উন্মাদ। অথচ এর মধ্যে এতোটুকু কল্পনা নেই, সবটাই বাস্তব! তবে কি গজুদা সত্যি-সত্যি রাজা হ'তে চললেন? জম্বুদ্বীপের জনসাধারণ 'রাজা' বললে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে ভেবেই হয়তো এঁরা তাঁকে 'ম্যানেজিং ডিরেক্টার' নাম দিয়ে সিংহাসনে নিয়ে গিয়ে বসাচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে রাজমুকুট মাথায় পরবেন গজুদা।

তার নিজের অফিস-কামরায় পায়চারি করতে লাগল দুলাল। পঁচাত্তর ফুট লম্বা রাস্তাটা ধ'রেই হাঁটছিল সে। দু'দিকে ঝাউ আর পাম্ গাছের সারি। কতো শখ ক'রে রাস্তাটার নাম রেখেছিল গজানন অ্যাভিন্যু! বড় বড় কাঠের টব তৈরি করাতে হয়েছে। ছোট ছোট টবও আছে। তাতে বিলেতী ফুলের গাছ লাগানো। বড় গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে খাঁচা টাঙিয়ে রেখেছে। তাতে কতোরকমের পাখি। দিনরাত পাখিগুলো কিচিরমিচির করে। প্রকৃতির কোলে ব'সে দুলাল দত্ত সমাজতন্ত্রের ওপর আড়াই হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিটা তৈরি করছে। অফিস-কামরার এক দিকে

গজানন অ্যাভিনু, অন্য দিকে ব্যায়ামাগার। মাঝখানে একটা ডিম্বাকৃতি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। সবই এখন ফেলে যেতে হবে। প্রহস্তনারায়ণ এক বছরের জন্য ভাড়া ক'রে ওঁদের নিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু সিংহাসনের আরাম পেলে গজুদা হয়তো আর মহা-নগরীতে ফিরে আসতে চাইবেন না। এমন সুন্দব একটা সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। শোকসভা কোম্পানি প্রাইভেট লিমি-টেডের মতো পরমাশ্চর্য কারবারটিও যাবে নষ্ট হ'য়ে। শোকসভা কোম্পানিব জন্য একদিন হয়তো শোক কবতে বসবে দেশের জনসাধারণ।

পাণ্ডুলিপির একশো ছাব্বিশটা অধ্যায় ঘরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পৃষ্ঠাসংখ্যা মিলিয়ে মিলিয়ে গুছতে লাগল তুলাল। বকেট-জাহাজ কতোটা মাল বহন কবতে পারবে তার হিসেবটা জেনে নেওয়াব জন্য প্রহস্তনারায়ণেব ঘরে এসে উপস্থিত হ'ল সে। মনের অবস্থা শোচনীয়। এক বছর পর ফিবে এসে হয়তো বিলাপ করতে বসবে : সেই বামও নেই, অযোধ্যাও নেই!

ঘবে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তুলাল। টিফিন-ক্যারিয়ারের গায়ে গোটা-পাঁচ কল বসানো। তারই একটা কলের মুখে গজুদা নিজের মুখ লাগিয়ে রেখেছেন। পাশে ব'সে রয়েছেন প্রহস্তনারায়ণ। মৃত্থ-মৃত্থ হাসছেন তিনি। তুলালের আঘাত লাগল খুব। ওকে না জানিয়ে গজুদা একা-একাই টিফিন-ক্যারিয়ারেব কল চুষছেন। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন দাদা?

প্রহস্তনারায়ণ বললে, "জম্বুদ্বীপের পানীয় জল পরীক্ষা ক'রে দেখছেন উনি।"

"আমিও পবীক্ষা করব।" গজাননবাবুর পাশে ব'সে পড়ল তুলাল। মুখুজ্জেমশাই তবু কলের ওপর মুখ থুবড়ে প'ড়ে রইলেন। তুলাল ঝুঁকে বসল। গজুদার তুটি চোখই মুদ্রিত। কপালটি ঘর্মাক্ত। মনে হ'ল, স্বর্গসুখ উপভোগ করছেন তিনি। মদন

জ্বলছে, পুড়ছে—বোধহয় ভস্মও হ'য়ে গেল! গজাননবাবুর বাব্‌রি চুলের মধ্যে ডান হাতের পাঞ্জাটা ঢুকিয়ে দিল দুলাল। ঝাঁকুনি দিয়ে দেখল, নাঃ, নড়ানো গেল না। চুম্বকের দ্বারা সাংঘাতিক-ভাবে আকর্ষিত হয়েছেন গজুদা। দুই ঠোঁটের মাঝখানে কলের মুখটা তলিয়ে গিয়েছে। ঠোঁটে বিন্দুমাত্র কম্পন নেই। বোধহয় শুধু জিহ্বার দ্বারা জল টানছেন তিনি। কল্পনা করতে করতে দুলাল নিজেও ঘেমেচুমে অস্থির হ'য়ে উঠল। তারপর মরীয়া হ'য়ে দু' হাতের পাঞ্জা দিয়ে বাব্‌রি চুলের গুচ্ছ ধ'রে হেঁচকা টান মারল সে। চিৎ হ'য়ে প'ড়ে গেল দুলাল। গজানন মুখুজ্জে অতিকষ্টে তাঁর নিজের ভারসাম্য রক্ষা করলেন। মেঝে থেকে উঠে ব'সে দুলাল জিজ্ঞাসা করল, "এ কিরকম ব্যাভার তোমার? কী খাচ্ছিলে তুমি? উনি বললেন, পানীয় জল। আমার মনে হ'ল, কলের ছিদ্রে জিব ঠেকিয়ে ইয়ার্কি মাবছ—"

কপালের ঘাম মুছে মুখুজ্জেমশাই বললেন, "জল নয় বে, অমৃত। এক বিন্দু পেটে যাওয়ার পবেই মনে হ'ল, ফতুল্লায় চ'লে গিয়েছি··· পারু এসেছে। কী জলই না এনেছেন দাদা! অমৃত, সেরেফ অমৃত!"

"অমৃত না ঘোড়ার ডিম—" তেড়ে উঠল দুলাল, "কী খাচ্ছিলে ঠিক ক'রে বলো।"

"বিশুদ্ধ অমৃত, আদি এবং অকৃত্রিম।"

"বাজে কথা বোলো না, গজুদা। আমি দেখেছি, তুমি মদনভস্ম খাচ্ছিলে।"

যাত্রার পূর্বে নতুন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঝগড়া লেগে যেতে পারে ভেবে প্রহস্তনারায়ণ টিফিন-ক্যারিয়ারের ওপরের বাটিটা খুলে ফেললেন। ক্লাইভ স্ট্রীটের দিকের জানালাটা খোলা ছিল। ধাক্কা মেরে টিফিন-ক্যাবিয়ারটা সরিয়ে নিয়ে গেলেন জানালার কাছে।

এক মিনিট পর প্রহস্তনারায়ণ ঘোষণা করলেন, "মহানগরীর

হাওয়া ঢুকিয়ে দিলুম এতে। এখন আর কিচ্ছু রইল না—কোটি কোটি মারাত্মক বীজাণু ঘর বাঁধল টিফিন-ক্যারিয়ারে।”

ব্যথিতচিত্তে গজানন মুখুজ্জে জিজ্ঞাসা করলেন, “রাত্রে তা হ'লে খাবেন কি আপনি? ছি ছি, এমন কাজ কেন করতে গেলেন, প্রহস্তনারায়ণবাবু?”

“তোমার কাণ্ড দেখলে মানুষের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, গজুদা। জম্বুদ্বীপে গিয়ে কি যে করবে তুমি ভেবে শিউরে উঠছি আমি! মদনের মতো তোমাকেও হয়তো দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, গজুদা!”

“ছুঁতে পারলি না কিনা, তাই আঙুরের গুচ্ছটিকে টক বলছিস তুই। দুলাল, তোর অশিক্ষিত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে দুঃখ বোধ করছি। আগামীকাল সকালে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করবি, আর আজকে তুই মদনভস্মকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলি? হাতের কাছে পেলে মদনভস্ম কে না খায় বল্? ষাট, সত্তর, আশী বছরের বৃদ্ধরাও চেষ্টা করতে ছাড়ে না।”

“তাই ব'লে তুমি সবার সামনেই খাবে নাকি? পট্‌লী যদি দেখত?”

“হ্যাঁ, এই কথাটা ঠিক বলেছিস। যতোক্ষণ না ধরা পড়ছে, চোরকে চোর বলা আইনবিরুদ্ধ। অপরাধ স্বীকার করছি দুলাল।”

“এ শুধু আইনের ব্যাপার নয়, এর মধ্যে সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রশ্নও আছে। মদন সৌন্দর্যতত্ত্বের ধার ধারে না, কিন্তু তুমি তো আর মদনের মতো গণ্ডার নও। তুমি হচ্ছ গিয়ে একজন আদর্শ সাম্যবাদী।”

মানসিক এবং দৈহিক উত্তেজনা প্রশমিত হ'তে মিনিট-পাঁচেক সময় লাগল দুলালের। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে ওর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে অনেক। অতএব উত্তেজনাটুকুকে দ্রবীভূত করতে মিনিট-পাঁচেক সময় ওকে দিতেই হ'ল।

গজাননবাবু চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। মুখ নিচু ক'রে রেখেছিলেন। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল কয়েকগাছা কাঁচা-পাকা চুলের ওপর। এতো লম্বা চুল এখানে আর কারো নেই। এ-চুল তাঁর নিজেরই। দুলাল যে কী সাংঘাতিকভাবে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পেলেন গজাননবাবু। এতোগুলো চুল টান মেরে ছিঁড়ে ফেলেছে সে!

ঘরের আবহাওয়া স্বাভাবিক করবার উদ্দেশ্যে প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "খেয়ে-দেয়ে আপনারা আজ শুয়ে পড়ুনগে যান। পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগলেও, দূরত্ব সাড়ে বাইশ হাজার মাইল। একটু গা গুলতে পারে।"

"আমরা ম্যানেজ ক'রে নেব।" বলল দুলাল, "দেখুন প্রহস্ত-নারায়ণবাবু, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। সঙ্গে তো আমাদের মালপত্র কিছু যাচ্ছে না। আপনার রকেট-জাহাজ কতোটা ওজন বহন করতে পারে?"

"কেন বলুন তো?"

"আমার সঙ্গে একটি আড়াই হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি যাবে।"

"কিসের পাণ্ডুলিপি, দুলালবাবু?"

"সমাজতন্ত্রের।"

"ও নিয়ে কি করবেন? কে পড়বে থিওরি? জম্বুদ্বীপের সবাই সমাজতান্ত্রিক—শুধু ঐ সদানন্দ ভট্‌চাজ ছাড়া। আমাদের ওখানে সমাজতন্ত্রের বয়স প্রায় একশো বছর হ'ল। একটু পুরনো ব'লেই শাসনব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে। চলুন, দেখবেন সব। বোধহয় নতুন থিওরি লিখতে হবে আপনাকে। বিপদে না পড়লে কি আপনাদের শরণ নিতুম? আপনি বরং পাণ্ডুলিপিটা সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রেখে যান।"

মনটা খারাপ হ'য়ে গেল দুলালের। এতোদিনের তপস্যার ফল মহানগরীর সিন্দুকে আবদ্ধ হ'য়ে থাকবে! তার চেয়ে বরং টেবিলের

ওপর খোলা প'ড়ে থাক। কেউ যদি চুরি ক'রে নিয়ে যায় তাতেও কাজ হ'তে পারে। বিদ্যা-চুরির মতো থিওরি-চুরিও পুণ্য কাজ। মহানগরীর যদি তাতে উপকার হয় তবে ওপরে ব'সেও দুলাল কৃতার্থ বোধ করবে। দেশ এবং দশের উপকার করবার জন্যই সে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিল। নইলে জম্বুদ্বীপের সন্তান হওয়া তার পক্ষে অসুবিধা কিছু হ'ত না।

দুলাল ভেবেচিন্তে বলল এবার, "দেখুন প্রহস্তনারায়ণবাবু, পাণ্ডুলিপি রেখেই যাচ্ছি আমি। কিন্তু মদন আমাদের সঙ্গে যাবে।"

গজাননবাবু বললেন, "মহানগরীকে কানা ক'রে রেখে যাবি, দুলাল? তা ছাড়া জম্বুদ্বীপের পানীয় জল খেয়ে মদন হয়তো পুরো দ্বীপটিকে ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো ক'রে দেবে! কী দরকার ওকে নিয়ে যাওয়ার?"

"যাক, সঙ্গে যাক মদন।" বললেন প্রহস্তনারায়ণ, "আমাদের অঞ্চলে পশুর বড় অভাব। সদানন্দ দেখলে বুঝতে পারবে, পশুকে বাদ দিয়ে সমাজবিজ্ঞান চলে না। আমরা যতই সভ্য এবং সমাজতান্ত্রিক হ'য়ে উঠি না কেন, পশুর মতো আমাদেরও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। পশুর মতো আমাদেরও যৌনক্ষুধা প্রবল এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার প্রবৃত্তিও প্রখর। হাজাব চেষ্টা করলেও গোড়ার ঋণ আমরা শোধ করতে পারব না। আমাদের দেহে এবং মনে পশু-পাওনাদারটি সর্বক্ষণই উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। তাগাদার ভয়ে তুরীয়লোকে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকলে চলবে কেন, মুখুজ্জেমশাই? যাক, মদন সঙ্গে যাক।"

মানুষের আদি ইতিহাসটুকু শুনে দুলালের বড় ভালো লাগল। শুধু ঐ সদানন্দ লোকটির সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ হ'তে লাগল ওর। আজ সমস্তদিনের মধ্যে বার-কয়েক ঐ নামটার উল্লেখ করেছেন প্রহস্তনারায়ণ। তবে কি সদানন্দ ভট্‌চাজকে শাসন

করবার জন্যই গজাননবাবু আর দুলালকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা? ব্যাপারটা একটু জটিল ব'লে মনে হচ্ছে ওর। ছোকরাটি কি শেষ পর্যন্ত দুলালের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়াবে? সে জিজ্ঞাসা করল, "সদানন্দ ভট্চাজের বয়স কতো?"

"পঁচিশ। দেখতে অনেকটা সেই অলৌকিক বলশালী স্যামসনের মতো।" বললেন প্রহস্তনারায়ণ।

"অবিবাহিত নাকি?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল দুলাল।

"হ্যাঁ। জম্বুদ্বীপে ছলনাময়ী ডিল্যাইলার বড় অভাব।"

ঘরে ঢুকল পটলী।

॥ তিন ॥

সারারাত ঘুমতে পারেনি দুলাল। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে কাল সকালেই উড়ে যেতে হবে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে সাড়ে বাইশ হাজার মাইলের ভবিষ্যতের বন্দরে গিয়ে পৌঁছতে। সময় যতোই কম লাগুক না কেন, দূরত্ব তাতে কমবে না। তাও দূরত্বটা যদি বসুন্ধরার বুকের ওপর হ'ত, ভয় করত না দুলালের। আকাশের মহাশূন্যতায় জম্বুদ্বীপের অবস্থান ব'লেই আশঙ্কায় বুকটা ওর দুরুদুরু করছে। সর্বক্ষণই মনে হচ্ছে পায়ে বোধহয় কোনোদিনই আর মাটি ঠেকবে না। একটা বছর দোদুল্যমান অবস্থায় জীবন যাপন করতে হবে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঝুলে থাকার অস্বস্তিকর অনুভূতির জন্যই রাত্রে ঘুমতে পারল না সে।

দ্বিতীয় অনুভূতিটাও পীড়িত করেছে ওকে। সেই অলৌকিক বলশালী স্যামসন ছোকরাটাকে পছন্দ হচ্ছে না দুলালের। নিজের দেহ দুর্বল ব'লে বলশালী লোকদের প্রতি ওর গোপন ঈর্ষা আছে। সব-কিছুই এখন নির্ভর করছে পটলীর ওপর। সে যদি জম্বুদ্বীপে গিয়ে মস্তিষ্কের শক্তিকে শ্রদ্ধা না করে তা হ'লেই সবনাশ ঘটবে।

বাঙালীর যেটুকু ঐতিহ্য আছে তা তো শুধু মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক। থুতনি এবং ঘাড়ের তলা থেকে পুরুষের চৌদ্দ আনা দেহটার প্রতি এতোকাল বাঙালী মেয়েরা বিশেষভাবে নজর দেয়নি। এখন জম্বুদ্বীপে পৌঁছে পটলী যদি প্রাচীন ঐতিহ্য বর্জন ক'রে ছলনাময়ী ডিল্যাইলা সেজে যায় তা হ'লে ছুলাল কি করবে? অফিস-কামরায় পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে মুগুর ছুটোর প্রতি করুণ দৃষ্টি ফেলছে সে। ছুটো বছর বই লিখে সময় নষ্ট করা উচিত হয়নি। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ব্যায়াম করা উচিত ছিল। থুতনিটা টিপে টিপে দেখতে লাগল ছুলাল। চামড়া আর হাড়ের মাঝখানে মাংস নেই। গালের চামড়াও তো আমসীর মতো শুকনো—বাচ্চাদের মার্বেল খেলার গর্তের মতো ছু'দিকেই ছুটো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। কপালের চামড়াও মসৃণ নেই। চব্বিশ ঘণ্টাই একটা রগ নারকোলের দড়ির মতো ফুলে থাকে। হাত ঠেকালেই খরখর করে। এই রগটির জন্য পটলী কতো সুখ্যাতি করত ওর। বলত—"ছুলুদা, এটা তোমার ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল রগ। এ শুধু বাঙালীর কপালেই থাকে।"

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজাননবাবুর শয়ন-কামরার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল ছুলাল। ঢুকেই সে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। গজাননবাবু একি করছেন! ল্যাঙট প'রে মেঝের ওপর বুক-ডন্ দিচ্ছেন তিনি। আগে ক'টা দিয়েছেন, ছুলাল তা জানে না। এখন সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এক, ছুই ক'রে গুনতে লাগল। একশোতে এসে থামলেন মুখুজ্জেমশাই। ছুলাল জিজ্ঞাসা করল, "আগে ক'টা দিয়েছ, গজুদা?"

"একশো।"

"সবসুদ্ধ ছু'শো বুক-ডন্ দিলে?" বিস্ময়ের ঠেলায় ছুলালের চোখের মণি প্রায় বেরিয়ে আসবার উপক্রম।

"কি করব, অগ্নিযুগের অভ্যাস। এখন ছেড়ে দিলেই, স্বাস্থ্যটি আর বাঁচবে না।"

"পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছ, কার জন্য স্বাস্থ্য বাঁচাচ্ছ গজুদা ?"

তোয়ালে দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে গজানন মুখুজ্জে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার প্রাইভেট ব্যাপারের মধ্যে উঁকি দিতে এলি কেন ? কি চাই তোর, দুলাল ?"

"আমি বিয়ে করতে চাই, গজুদা।"

"এখনো সুয্যি ওঠেনি, বড্ড বেশি বকছিস।"

"রওনা হওয়ার আগে বিয়েটা শেষ ক'রে যেতে চাই আমি।"

"ফ্যাচর-ফ্যাচর করিস্‌নে দুলাল, সকালের কর্তব্য শেষ করতে দে।" গজানন মুখুজ্জে এবার জোড়-আসন কেটে মেঝের ওপর বসলেন।

এগিয়ে গেল দুলাল। জিজ্ঞাসা করল, "আবার কি করছ তুমি, গজুদা ?"

"যোগ।"

"যোগ-বিয়োগ করতে আগে তো কখনো দেখিনি ?"

জবাব দিলেন না গজাননবাবু। দুলাল দেখল, ছ' ফুট লম্বা মানুষটা দু' হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা নিচু ক'রে ঠেকিয়ে দিলেন মেঝের সঙ্গে। তারপর পা দুটো ধীরে ধীরে সিলিং-এর দিকে উঁচু ক'রে দিলেন। মাথার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন গজুদা! কাণ্ড দেখে দুলালের শরীর প্রায় অবশ হ'য়ে গিয়েছে। নিজের রুক্ষ এবং অবিন্যস্ত চুলের গোড়ায় আঙুল ঢুকিয়ে চুলকোতে লাগল সে। মিনিট-পাঁচেক পর মুখুজ্জেমশাই আবার জোড়-আসন কেটে মেঝেতে বসলেন। দুলাল বলল, "মাইরি বলছি গজুদা, একটা সার্কাস কোম্পানি খোলো। তোমাকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক টিকিট কাটবে। কী সাংঘাতিক ব্যালান্স তোমার!"

"জম্বুদ্বীপের শাসনভার নিতে যাচ্ছি, ব্যালান্স না থাকলে ওঁরা আমাকে ডাকতে আসবেন কেন রে, ছোঁড়া ?"

ছ' ফুট লম্বা মানুষটা দু' হাতের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা নিচু ক'রে ঠেকিয়ে দিলেন মেঝের সঙ্গে।

"জম্বুদ্বীপের ইতিহাসে তুমি অমর হ'য়ে থাকবে। গজুদা, আমায় একটু শেখাও-না—"

"এসেছিলি তো বিয়ে করতে, হঠাৎ আবার ব্যালান্স শিখতে চাইছিস কেন?"

ঘরের বাইরে থেকে পটলী বলল, "বাবা, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। প্রহস্তনারায়ণবাবু বললেন, আর দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হ'তে হবে।"

চলেছে নতুন দেশে। স্বয়ংক্রিয় ব'লে, জাহাজ চালাবার জন্য পাইলট রাখতে হয়নি। ভেতরের ব্যবস্থাও সুন্দর। বসবার এবং শোবার বন্দোবস্ত আলাদা আলাদা। জাহাজের চতুর্দিকে শ'-দুয়েক সুইচ। রকেটে উঠে প্রহস্তনারায়ণ বড় একটা সুইচ টিপে দিলেন। জাহাজটি উচ্চমার্গে আরোহণ করতে লাগল।

সবার মনেই স্ফূর্তির ঢেউ বইছিল। দেশে দেশে উড়ে চলবার কী সহজ ব্যবস্থাই না হয়েছে! শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে মহানগরী থেকে রওনা হলেন এঁরা, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে সাড়ে বাইশ হাজার মাইল ঊর্ধ্বে উঠে ব্রেকফাস্ট খাবেন। মদনকে ধ'রে ব'সে ছিল দুলাল। ভোরবেলা সাবান এবং সোডা মাখিয়ে গরম জল দিয়ে স্নান করিয়ে এনেছে, তবু গায়ের গন্ধ পুরোপুরি মরেনি। তার ওপর জাহাজে উঠে বড্ড বেশি উসখুস করছে। দু' হাঁটুর মাঝখানে গণ্ডারের দেহটাকে চেপে ধ'রে রেখেছিল দুলাল। কিন্তু হাজার-দুই মাইল ঊর্ধ্বে ওঠার পর মদনের চঞ্চলতা আয়ত্তের বাইরে চ'লে যেতে লাগল। ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছিল না। জাহাজ ভেঙে বেরিয়ে না পড়ে! পটলী বলল, "বোধহয় ভারতবর্ষের মায়া কাটাতে পারছে না। এক কাজ করো দুলুদা, ওকে আমার কাছে দাও, ঘুম পাড়িয়ে রাখি।"

"ভারতবর্ষের মায়া কাটাতে হয়তো পারবে। কিন্তু মোহিনী

মায়ায় ওকে আর তুমি আবদ্ধ কোরো না, পাটুল। আমি ওকে ঘুম পাড়াচ্ছি : খোকা ঘুমলো, পাড়া জুড়লো, বর্গী এল দেশে—"

পদ্য শুনে সাংঘাতিক রেগে গেল মদন। নাকের ওপর রোঁয়ার গুচ্ছ এখন আর কচি ঘাসের মতো নেই। খানিকটা শক্ত হ'য়ে উঠেছে। যৌবনের প্রাথমিক সুড়সুড়ি রোঁয়ার গোড়ায় অনুভব করে সে। কালক্রমে এটাই হবে শিং—মানুষ মারবার কল। পদ্য শুনে মদন ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করতে লাগল। পট্‌লী বলল, "ওকে তুমি খোকা বলসে কিনা, তাই রেগে গিয়েছে। কবিতা শোনাও।"

পট্‌লীর উপদেশ গ্রহণ করল ছুলাল। মদনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে আবৃত্তি কবতে লাগল সে :

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'বে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে

পুরো কবিতাটি পাঠ করল ছুলাল। ঘুমিয়ে পড়ল মদন। আহা, দেহটা যেন থলথলে মাংসপিণ্ডের মতো প'ড়ে রইল পায়ের কাছে! চামড়া পর্যন্ত ঢিলে হ'য়ে গিয়েছে। কচি লাউ-এর খোসার মতো মসৃণ। মদনকে আর পশু ব'লে চেনাই যাচ্ছে না। সে সত্যি-সত্যি বোধহয় বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। গজাননবাবুর দিকে ঝুঁকে ব'সে ছুলাল জিজ্ঞাসা করল, "আজকের খবরের কাগজ এনেছ, গজুদা?"

"এতো ওপরে উঠেও নিচেব দিকে দৃষ্টি দিচ্ছিস? জ্বালালে দেখছি!"

প্রহস্তনারায়ণ ক্ষুদ্রাকার একটি সুইচ টিপে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেব সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। সেই পরিচিতা কণ্ঠস্বর : আকাশবাণী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতবর্ষের সর্বনাশের মূলে শুধু জাত-বিভাগের ব্যাধি। বাংলায় খবর বলা এইখানে শেষ হ'ল।

পদ্য শুনে মদন ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে লাগল

প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "বারো হাজার মাইল উর্ধ্বে উঠেছি। বিংশ শতাব্দী শেষ হ'য়ে গেল, দুলালবাবু।"

"আজো তবু সেই একই জাত-বিভাগের খবর প্রচারিত হচ্ছে।" বললেন গজানন মুখুজ্জে।

দুলাল সহসা অঙ্কশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল সে, "দেখুন প্রহস্তনারায়ণবাবু, আপনার কথাটি ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমরা তো বারো হাজার মাইল পথ অতিক্রম করলুম, তাতে শতাব্দী শেষ হ'ল কি ক'রে?"

"আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কশাস্ত্রও উর্ধ্বে উঠছে, দুলালবাবু। হায়ার ম্যাথ্‌মেটিকস্‌।" মৃদুহাসির হিল্লোল প্রহস্তনারায়ণের মুখে, "একবিংশের সীমানা শুরু হ'ল।"

গজাননবাবু দুলালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসলেন, "বই লিখলেই মানুষ সমাজতান্ত্রিক হয় না। দুলাল, আসলে তোর মনটা বড্ড প্রতিক্রিয়াশীল। একবিংশের প্রথম স্তর পার হচ্ছি। এটা বোধহয় পাললিক শিলাময় অঞ্চল। দেখতে পাচ্ছিস?"

"না তো!" দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল দুলাল। জানালার কাঁচের সঙ্গে নাক ঠেকিয়ে বসল সে। সাদা-সাদা খড়িমাটির গুঁড়োর মতো সত্যি-সত্যি কি যেন উড়ছে!

প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "চোখ দিয়ে ঠিক শতাব্দীকে দেখতে পাবেন না। শতাব্দী তো একটা বস্তু নয়। জম্বুদ্বীপে পৌঁছলে একবিংশের ক্রিয়াকলাপ দেখতে পাবেন। এখন শুধু স্তরায়ণ-অনুভূতির দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, মাইলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কালের স্রোতও পার হচ্ছি।"

"আমার গা গুলচ্ছে মশাই! বমি করব—"

সুইচ টিপলেন প্রহস্তনারায়ণ। জাহাজের গা থেকে একটা গামলা বেরিয়ে এল। এসে খাড়া হ'য়ে রইল দুলালের মুখের সামনে। গতরাত্রের খাদ্যাদি সব গামলার মধ্যে পড়ে গেল।

তারপর আবার সুইচ টিপলেন প্রহস্তনারায়ণ। জাহাজের গায়ে গামলাটা কুট্ ক'রে মিশে গেল। প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "জম্বু-দ্বীপের বন্দরে পৌঁছবার আগে বিংশ শতাব্দীর সব-কিছুই ফেলে যেতে হবে।"

গজানন মুখুজ্জে বললেন, "আজ সকালে যে আমি এক জগ্ বাদাম-পেস্তার শরবত খেয়ে এসেছি, মশাই।"

পট্লী ব'লে উঠল, "বাবা, আমারও গা গুলচ্ছে!"

"পট্লী, আমারও!" নিজের বুকের ওপর হাত বুলতে লাগলেন গজাননবাবু।

প্রহস্তনারায়ণ দেরি করেননি। সুইচ আগেই টিপে দিয়েছিলেন। দুটো নতুন গামলা বেরিয়ে এল। প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "একবিংশটা বড্ড খুঁতখুঁতে শতাব্দী। বিংশের ছোঁয়া জিনিস তার এলাকার মধ্যে ঢুকতে দেবে না। ভেতরটা আপনাদের পরিষ্কার হ'য়ে গেল। এবার শুধু বন্দরের লেবরেটরিতে রোমকূপগুলো পরিষ্কৃত হ'য়ে গেলেই জম্বুদ্বীপের মাটিতে পদার্পণ করতে পারবেন আপনারা। আমি সঙ্গে রয়েছি, ভয় করবেন না, দুলালবাবু।"

"বন্দরটি আর কতোদূর?" জিজ্ঞাসা করল দুলাল। এবার সে ক্লান্ত বোধ করছে। গজাননবাবু শুয়ে পড়েছিলেন আগেই। পট্লী চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে রয়েছে। এঁরা সবাই ভেবেছিলেন, পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময়টা তো কিছুই না। ফস্ ক'রে কেটে যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সময়টাই মুখ্য, সাড়ে বাইশ হাজার মাইলের দূরত্বটা গৌণ। সময় যেন আর কাটতে চাইছে না! মনে হচ্ছে এক-একটা মিনিট খরচ হ'তে এক-এক বছর সময় লাগছে। কী বিচিত্র অনুভূতি! বস্তুজগতের অস্তিত্ব ব'লে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ঈষৎ-পূর্বের খড়িমাটির গুঁড়ো পর্যন্ত মহাশূন্যতা থেকে লোপ পেয়েছে। সারা অনুভূতি জুড়ে বয়ে চলেছে শুধু কাল। যতোবারই দুলাল ক্রিয়ার কাল

হিসেবে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করবার চেষ্টা করতে লাগল, ততোবারই সে ক্রিয়াপদটি স্মরণ করতে পারল না। কেবল আদি-অন্তহীন কালের অস্তিত্বটুকু অনুভব করছে সে। তা হ'লে কি কালের কোনো বর্তমান নেই? বোধহয় নেই। বর্তমানটুকুও মানুষের কল্পনা।

"হায়ার ম্যাথ্‌মেটিকস্‌ বড় সাংঘাতিক শাস্ত্র, মশাই!" বলল দুলাল।

"হ্যাঁ। জম্বুদ্বীপ আর ভারতবর্ষের মাঝখানটায় যতো গণ্ডগোল! গন্তব্যে পৌঁছলে সহজ হ'য়ে যাবে সব।"

"আর কতোক্ষণ লাগবে?"

"দেখা যাচ্ছে। এসে পড়েছি।" প্রহস্তনারায়ণ খেলনার চাকার মতো একটা চাকা ঘুরিয়ে দিলেন। রকেট-জাহাজটা এতোক্ষণ খাড়াভাবে উঠছিল। এবার সেটা নৌকোর মতো হাওয়ায় ভাসল। স্থানকালের স্বাভাবিক অনুভূতি ফিরে এল আবার। পায়ের দিকে নজর দিতে গিয়ে দুলাল দেখল, নিজে থেকেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছে মদন।

শূন্যমার্গে বোধহয় পশুদের জেগে থাকবার ক্ষমতা নেই।

জম্বুদ্বীপের রকেট-বন্দরে অবতরণ করবার পর এঁরা আশা করেছিলেন, অন্তত লাখ-পাঁচেক লোক সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য উপস্থিত থাকবে। কিন্তু নেমে দেখলেন, একটি লোকও নেই! কুলীদের তো থাকবার কথা নয়। মালপত্র নেই সঙ্গে। রোদ উঠেছে, কিন্তু তাপ খুব কম। বসন্তঋতুর মতো মনে হ'ল দুলালের। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মহানগরীতে নাকি বসন্তের আবির্ভাব হ'ত। আজকাল তো ঋতুর মধ্যে মাত্র শীত, গ্রীষ্ম আর বর্ষা কোনোরকমে টিকে রয়েছে। হাঁ ক'রে মৃদুমধুর হাওয়া খেতে লাগল দুলাল। গজাননবাবু বললেন, "আদেখ্‌লেপানা করিস্‌নে। চল্‌, রোমকূপ পরিষ্কৃত ক'রে আসি।"

"মদনও চলুক।"

প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "পশু হচ্ছে আদি প্রকৃতি। পরিষ্কার করবার কিছু নেই। তা ছাড়া, মদন হচ্ছে গণ্ডার। ভারতবর্ষের ময়লা ওর চামড়া ভেদ করতে পারেনি। বড় শক্ত জানোয়ার। ভেতরে ঢুকুন আপনারা।"

লেবরেটরির ভেতরেও আবার সুইচের ব্যবস্থা। লোকজন কেউ নেই। প্রহস্তনারায়ণ সুইচ টিপলেন। ইস্পাতের চাদর দিয়ে তৈবী একটি মানুষ চেয়ারে ব'সে ছিল। রক্তমাংসের মানুষেব মতোই সে হাত বাড়িয়ে প্রথমে টেনে নিল দুলালকে। সবার সামনে ছিল সে। তারপর মেকানিক্যাল মানুষটি ঝাঁটার মতো একটা বুরুশ দিয়ে দুলালের রোমকূপ পরিষ্কার করতে লাগল। প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "মা পাটুল, তুমি পাশের কামরায় যাও। সেখানেও একজন ইস্পাতের স্ত্রীলোক আছেন। বুঝলেন মুখুজ্জে-মশাই, জম্বুদ্বীপের আসল সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যার অভাব। সেইজন্য এখানে জ্যান্ত বৈজ্ঞানিকের বদলে ইস্পাতের বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করতে হয়েছে।"

পরিষ্কৃত হ'তে হ'তে দুলাল বলল, "এও দেখছি স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক! হাতে রক্তমাংস না থাকলে কি হবে, প্রীতির পুঁজি অনেক। গজুদা, একটুও লাগছে না। এই ছাখো, দমাদম ঝাঁটা মারছে—অথচ আরাম লাগছে খুব!"

"লাগবেই তো, শতাব্দীর পাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছিস কিনা। লেবরেটরির মেঝের দিকে চেয়ে ছাখ্, রোমকূপ থেকে কতো ময়লা বেরিয়েছে।"

"তোমারও বেরুবে, গজুদা।"

প্রহস্তনারায়ণ অভয় দিয়ে বললেন, "বিংশ শতাব্দীর লোক আপনারা, এই তো স্বাভাবিক। করপোরেশন থেকে দুটো ট্রাক এসে লেবরেটরির পেছন-দরজায় অপেক্ষা করছে। দু গাড়ির

বেশি ময়লা যদি হয় তা হ'লে আরও একটা আসবে। ভয় নেই।”

তুলাল পরিষ্কৃত হ'য়ে গেল। শরীরটা বেশ ঝরঝরে লাগছে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম একটি পুরো মানুষ। বাহুল্য নেই, অভাববোধও অবলুপ্ত। তুলাল বলল, “কী সুন্দর দেশ, মশাই! একটি ধূলিকণা পর্যন্ত চোখে পড়ল না। চারদিকে শুধ্ সুইচ আর সুইচ! আপনাদের সুইচ-বাজ্যে বোধহয় আমি চিরদিনের জন্য র'য়ে গেলুম। তুমি কি করবে গজুদা?”

“দেখি, আগে পরিষ্কৃত হ'য়ে নিই। হস্তনারায়ণবাবু, আপনাদের এই সমাজতান্ত্রিক' দেশটার একটা ইতিহাস-বই দেবেন। পড়ে দেখব।”

এই সময়ে পট্‌লী বেরিয়ে এলো পাশের ঘব থেকে। প্রহস্তনারায়ণ দেখেই বুঝতে পারলেন, মেয়েটি তো পরিষ্কৃত হয়নি! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কি হ'ল, মা?”

“আপনাদের স্ত্রীলোক বৈজ্ঞানিকটি বোধহয় আউট-অব-অর্ডার। এতোক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম আমারই ভুল হ'ল কিনা। যতোগুলো সুইচ ছিল সবগুলো একটা একটা ক'রে টিপে দেখলাম, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ঝাঁটা অনড় হ'য়ে রইল।”

গজানন মুখুজ্জের দেহের তখন অর্ধেকটা পরিষ্কৃত হ'য়ে গিয়েছিল। তিনিও ঘোষণা করলেন, “পুরুষ বৈজ্ঞানিকটিও আউট-অব-অর্ডার হ'ল।”

প্রহস্তনারায়ণ এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। কাউকে কোথাও দেখতে পেলেন না। ফিরে এসে বললেন, “স্যাবোটাজ! সদানন্দের দলের লোকেরাই করেছে। দেখুন মশাই, কী সাংঘাতিক বিপ্লবী এরা—আমাদের এই প্রাচীন সমাজ-তান্ত্রিক দেশটাকে ভেঙেচুরে তছনছ ক'রে দিতে চায়!”

“আমরা এসে পড়েছি, আর ভয় নেই। ঠেঙিয়ে ওর হাত-পা

সব ভেঙে দেব। এখন কি করবেন?” জিজ্ঞাসা করলেন গজাননবাবু।

“চলুন, পরে না-হয় আবার একবার আসবেন এখানে।” প্রহস্তনারায়ণের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল সবাই।

দুলাল বলল, “গজুদা, তোমাদের গায়ে যে বিংশ শতাব্দীর পাপ রইল তা কিন্তু ভুলে যেয়ো না।”

রকেট-বন্দরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলেন এঁরা জম্বুদ্বীপের সেনাবাহিনী কুচকাওয়াজ দেখাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। সেনাবাহিনীর রূপ দেখে চমৎকৃত হ'য়ে গেলেন গজানন মুখুজ্জে। প্রতিটি সৈনিক যেন এক-একটি বংশদণ্ডের মতো সরু। পরিপক্ক বংশদণ্ড। কালো কিংবা সাদা নয়। উজ্জ্বল হলদে রং। বংশ-দণ্ডের ওপর যেন এক-একটা ক'রে পাকা বাতাবিলেবু বসানো। দাড়ি কারো নেই, কিন্তু প্রত্যেকের নাকের তলায় বড় বড় গোঁফ। দুলাল বলল, “বোধহয় পুতুল-খেলার শো হচ্ছে।”

“না, না -” প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন প্রহস্তনারায়ণ, “এরাই জম্বুদ্বীপের নিরাপত্তা রক্ষা করে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে আমাদের জোয়ানবৃন্দ।”

“বহিঃশত্রু?” বিস্মিতভাবে মুখুজ্জেমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, “এখানেও বহিঃশত্রুর উৎপাত আছে নাকি?”

“স্বাধীন রাষ্ট্র হ'লেই তার বহিঃশত্রু থাকবে। প্রায় বছর পনরো আগে কেতুমাল ও হরিবর্ষ রাজ্যের শত্রুরা পশ্চিম এবং পূর্ব দিক থেকে জম্বুদ্বীপ আক্রমণ করে। দু'দিক থেকে দুটো প্রদেশ আমাদের জবরদখল ক'রে রেখেছে ওরা।”

“আপনাদের সেনাবাহিনী কি করছিল?”

“লড়াই করবার জন্য তারা খুবই উৎসাহ দেখিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি তখন রম্যক রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করতে বেরিয়ে-ছিলাম। সেই রাষ্ট্রের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মুচুকুন্দ সরকার মশাই

উপদেশ দিলেন যে, নিজের চোখে শত্রুর চেহারা না দেখে লড়াই করবার আদেশ পাঠাবেন না। ফিরে এসে দেখলুম, দখল সম্পূর্ণ হয়েছে। ঐ আমাদের প্রতিরক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার জহ্লাদ প্রামাণিক আসছেন। জম্বুদ্বীপের এক অতি প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশের একমাত্র কুলপ্রদীপ ইনি। প্রায় বিশ বছর আগে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। নাভির তলা থেকে বুড়ো-আঙুলের আগা পর্যন্ত পুরো অংশটাই অবশ। সেইজন্য স্ট্রেচারে শুয়ে ওঁকে চলাফেরা করতে হয়। ডিরেক্টারদের মধ্যে ইনিই সবচেয়ে বিদ্বান এবং কর্মঠ। এঁরই আদেশে সদানন্দকে আমরা একবার গ্রেপ্তার করেছিলুম। আবার এঁরই আদেশে এক ঘণ্টা পরে ছোড়াকে ছেড়েও দিয়েছিলুম আমরা।”

“এর মানে কি হ'ল, প্রহস্তনারায়ণবাবু?” জিজ্ঞাসা করল দুলাল।

“রণকৌশলনীতি বড় সাংঘাতিক জটিল বিজ্ঞান। একমাত্র জহ্লাদ প্রামাণিক ছাড়া আর কেউ এর মানে বুঝতে পারেননি।”

ময়দানের ওপর শামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল। শামিয়ানার তলায় মঞ্চ। এই মঞ্চের ওপর সবাই এসে বসলেন। প্রতিরক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার বসতে পারলেন না। তাঁর জন্য মঞ্চের ওপর একটা স্ট্রেচারের মাপে টেবিল পাতা ছিল। আটজন সৈনিক স্ট্রেচারটা এনে সেই টেবিলের ওপর ফেলে রাখল। তাঁর সঙ্গে গজাননবাবুদের পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রহস্তনারায়ণবাবু।

একটু পরেই এলেন প্রধান সেনাপতি ত্রিশঙ্কু সিং।

দুলাল জিজ্ঞাসা করল, “প্রধান সেনাপতির মাথায় টুপি কিংবা পাগড়ি নেই। অথচ কি যেন একটা দেখছি?”

“আপনার অনুমান মিথ্যে নয়,” অফিসিয়েল সুরে জবাব দিলেন প্রহস্তনারায়ণ, “প্রধান সেনাপতির বিশ্বাস, ঘরের বাইরে বেরুলেই তিনি নিচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছেন। ফলে, মাথায় তাঁর রক্ত উঠে

পড়ে। বোধহয় ত্রিশঙ্কু নাম রাখবার জন্যই বাল্যকাল থেকে এই-রকমের একটা সাইকোলজি-ব্যারামে ভুগছেন। মাথায় তাই একটা আইস-ব্যাগ বেঁধে রাখেন উনি। চলুন আপনারা, সৈনিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

ময়দানে ঘাস একটিও নেই। যেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছে দুলাল, সেইদিকেই শুধু সিমেন্ট আর কংক্রিট দেখতে পাচ্ছে। প্রকৃতির স্বাভাবিকতা কোথাও নেই। ময়দানের বুক ঝকঝক করছে। বালির অংশ খুবই কম, বোধহয় চোদ্দ আনাই সিমেন্ট। গাছপালা একটিও চোখে পড়ল না ওর। এতো বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে, এর মধ্যেই একটু যেন একঘেয়ে ঠেকছে। দূর থেকে সৈনিকদের দেখে দুলাল ভেবেছিল যে, পাকা বাঁশঝাড়ের আগায় বাতাবিলেবু ফলেছে। মদনের কাছে জম্বুদ্বীপটাকে অপরিচিত ব'লে আর মনে হবে না। সারা দেশটাই যদি এই ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় তা হ'লে মদন হয়তো অসুস্থ হ'য়ে পড়বে। ওর আবার সর্দিকাসির ধাত।

সৈনিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রধান সেনাপতি ত্রিশঙ্কু সিং। দুলাল দেখল, এদের সব মাজা শরীর। সোনার মতো রং। প্রতিটি রোমকূপের মুখ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। খুবই রোগা বটে, কিন্তু শীর্ণ নয়। কোমরগুলো সরু-সরু। ঘড়ির চেনের মতো এক-একটা ক'রে চেন্ ঝুলছে কোমর থেকে। চেনের মুখে প্ল্যাসটিকের দেশলাই বাঁধা। প্রশ্ন করার আগেই প্রহস্ত-নারায়ণ বললেন, "ভূতপূর্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টার বন্দুক তৈরির কারখানা সব বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ওদের কোমরে ওগুলো দেশলাই নয়, হাইড্রোজেন-বোমা। ছুঁড়ে মারলে, প্রতিটি বোমায় অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোক মরবে। সেইজন্য আজ পর্যন্ত একটিও ছোড়ার দরকার হয়নি। সদানন্দ যখন রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দেয়, তখন আমরা না পারি বোমা ছুঁড়তে, না পারি বন্দুক চালাতে।"

"সমস্যা খুব জটিল।" মন্তব্য করল দুলাল।

সেনাবাহিনী পরিদর্শনের পর ওঁরা আবার ফিরে এলেন শামিয়ানার তলায়। বাকী ডিরেক্টার যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই এসে পৌঁছে গিয়েছেন। সংস্কৃতি-বিভাগের ডিরেক্টার গজাননবাবুকে বললেন, "আমাদের দেশে ভাষা-সমস্যা নেই।"

"কি ক'রে সমাধান করলেন?" জিজ্ঞাসা করলেন মুখুজ্জে-মশাই।

"প্রায় সহস্র হন্দর রক্তপাতের পব আমি একটা ফরমূলা আবিষ্কাব করলুম। প্রাদেশিক ভাষার উন্নতিব জন্য কয়েক কোটি স্বর্ণমুদ্রা দান করতে লাগলুম প্রতি বছর। আব রাষ্ট্রভাষার উন্নতি-কল্পে খরচ করতে লাগলুম তাব চেয়ে দশগুণ বেশি। অফিসিয়েলী রাষ্ট্রভাষা এবং প্রাদেশিক ভাযা সবই রইল। কিন্তু কাজকর্ম সব চলতে লাগল ইংরেজী ভাষায়। জম্বুদ্বীপের লোকেরা শুধু প্রস্তাব পাস করলেই খুব খুশি হয়।"

এবাব বোর্ড অব ডিবেক্টাবদের মিটিং শুরু হবে। মিটিং-এর প্রধান প্রস্তাব হচ্ছে: নতুন ম্যানেজিং ডিবেক্টার আব জেনারেল ম্যানেজার নিয়োগ। প্রহস্তনাবায়ণ বলতে আরম্ভ করলেন:

"বাজে বক্তৃতা দিয়ে আপনাদেব অমূল্য সময় আমি নষ্ট কবব না। যাঁবা আজ জম্বুদ্বীপেব শাসনভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তাঁদের অবগতিব জন্য দু'একটা কথা বলা আমি প্রয়োজন মনে কবি। জম্বুদ্বীপেব সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রায় একশো বছবের পুবনো। চতুর্দিকেব অবস্থা এবং ডিরেক্টাবদের দেখে আপনাদের মনে হ'তে পাবে, একশো বছব নয়, হাজার বছরের পুরনো। সে যাই হোক, আমাদেব কর্তব্য আমরা করেছি। সমস্ত দেশটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শাসিত হচ্ছে। এক কণা ধুলো কোথাও পাবেন না। গাছপালা কিংবা লতাপাতা কেটেকুটে সাফ ক'রে দিয়েছি। একটা কংক্রিটের ছবির মতো মনে হবে জম্বুদ্বীপকে।

পথে বেরুলে দেখবেন ঘোড়ার-গাড়ি, গরুর-গাড়ি অথবা ঠেলা-গাড়ির ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত নেই। সুষুম্না-কেন্দ্রিক মোটরগাড়ি এবং রেলগাড়ি ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ব্যবস্থা আমরা রাখিনি। মৃত্যুর সময় ছাড়া এখানকার লোক কখনো কাঁদে না। চোখের জল ফেলবার অবকাশ কই তাদের? খাদ্য এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিস যার যার দরকারমতো হাত বাড়ালেই পেয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির দিক থেকেও আমরা রামায়ণ-বর্ণিত নিষ্কলঙ্কা সীতাদেবীর মতো আমাদের সতীত্ব সযত্নে রক্ষা ক'রে এসেছি। কাউকে আমরা ছুঁইনি, আমাদের ছুঁতেও দিইনি। শুধু পনরো বছর আগে এই নীতি ভঙ্গ করল কেতুমাল ও হরিবর্ষ রাষ্ট্রদ্বয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ঘোষণা করতে গর্ব অনুভব করছি যে, আমাদের নীতি ভঙ্গ করেছে বহিঃশত্রু, আমরা ভঙ্গ করিনি। এ-কথা জম্বুদ্বীপের ইতিহাস অবশ্যই সমর্থন করবে। (প্রচণ্ড করতালি)

"বন্ধুগণ, এতো খাটুনি এবং উন্নতির পরেও জম্বুদ্বীপের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। এর জন্য দায়ী আমাদের অর্থনীতি বিভাগের ডিরেক্টার শুভংকর সেনগুপ্ত মহাশয়। তিনি পিওর ইকনমিক্স ছাড়া আর কিছুই শেখেননি। আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে দিলেন! এক বছর আগে হঠাৎ জম্বুদ্বীপের জনসংখ্যা এতো বেশি বেড়ে গেল যে, শতকরা পঁচিশ ভাগ লোক উপবাস করতে লাগল। একটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হ'ল সেনগুপ্ত মহাশয়ের হাতে। তিনি ছ' মাসের মধ্যে দুটি মারাত্মক রকমের মন্বন্তর সৃষ্টি করলেন! সৃষ্টি করলেন বটে, কিন্তু হিসেব করতে ভুল ক'রে ফেললেন। শতকরা পঁচিশ ভাগের বদলে পঁচাত্তর ভাগ জনসংখ্যা সমূলে বিনষ্ট হ'য়ে গেল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রীয় সৎকার-বিভাগ সময়মতো কর্তব্য সম্পাদন ক'রে উঠতে

পারল না। বাসী মড়া পচতে লাগল। তদ্দরুন, আরও পাঁচ পারসেণ্ট লোক ব্যাধিতে ভুগে ভুগে পঙ্গু হ'য়ে গিয়েছে। বন্ধুগণ, এখন আমাদের প্রধান সমস্যা, রাষ্ট্রের এতো খাদ্য আর জিনিসপত্র নিয়ে কি করব? রপ্তানি-বাণিজ্য বন্ধ। কারণ, আমদানি করার দরকার নেই ব'লে অন্য কোনো দেশই আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চায় না। তার ওপর, সদানন্দ ভট্চাজ দল গড়েছে। রাষ্ট্রবিরোধী হ্যাণ্ডবিল ছেপে ছেপে চতুর্দিকে বিলি করছে। বিপ্লব আমাদের দরজায়—সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি সে ধ্বংস করতে চায়। সর্বসম্মতিক্রমে আপনারা এবার জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করুন। নিজেদের ডিরেক্টার আপনারা নিজেরাই বেছে নেবেন। এখানে প্রতিভাশালী কর্মীর অভাব নেই। আমরা পদত্যাগ করলুম। একবিংশ শতাব্দীর প্রগতি আপনারা রক্ষা করুন।"

শামিয়ানার সামনে একটা গরুর-গাড়ি এসে থামল। প্রহস্ত-নারায়ণ চিৎকার ক'রে উঠলেন, "ঐ—ঐ দেখুন, বিপ্লব এসে উপস্থিত হয়েছে! বিদেশ থেকে গরুর-গাড়ি আমদানি করেছে সদানন্দ। ওকে ইমপোর্ট লাইসেন্স দিল কে? মুখুজ্জেমশাই, সদানন্দকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিন। লাইসেন্স ও জাল করেছে।"

গজাননবাবু বললেন, "আসুক সদানন্দ, একবারটি ওকে দেখি। অপোজিশনকে গ্রেপ্তার করলে ডিমোক্র্যাসি বাঁচে না। এসো, নন্দ! তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি, ভাই।"

দুলালের কানের কাছে মুখ নিয়ে পারুলী বলল, "দেখেছ দুলুদা, ডিপ্লোম্যাসি-বিজ্ঞানে বাবা কিরকম ওস্তাদ!"

"ও-সব দেখবার এখন সময় নেই, পারুল। আমি দেখছি সদানন্দকে—"

"সত্যি, পাথরে-খোদাই গ্রীক মূর্তির মতো দেখতে।"

"গ্রীসের খাঁটি পাথর নয়, পারুল—মনে হচ্ছে জয়পুরের শ্বেতপাথর। মহানগরার ফুটপাথে বেচতে দেখেছি।"

রাষ্ট্রদপ্তরের আদবকায়দা সব বর্জন করলেন গজানন মুখার্জী। মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে তিনি সদানন্দের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, “এসো।”

“আমি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি গিয়ে আপনার সিংহাসনে আরোহণ করুন।”

“সিংহাসন কই ভাই ? ও তো একটা চাঁপ-কাঠের চেয়ার !”

“আমরা ওকে সিংহাসন নাম দিয়েছি।”

প্রহস্তনারায়ণ এগিয়ে এসে বললেন, “শুনলেন তো, কী সাংঘাতিক কথা ! চেয়ারকে সিংহাসন বলে ? ওকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিন। পরে তাল সামলাতে পারবেন না।”

গজাননবাবু বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। ভেটারেন বিপ্লবী তিনি। বিপ্লবের কতোরকমের ব্যাখ্যা তাঁর জানা আছে। একদা পাকড়াশীদা যা বিপ্লব ব'লে ভাবতেন এখন সেই পদ্ধতিতে বিপ্লব করতে গেলে, ওঁরা তাঁর নাম দেবেন উল্টো-বিপ্লব। অতএব সব কথা ভালো ক'রে না শুনে, ফস্ ক'রে সদানন্দকে গ্রেপ্তার করবেন না তিনি। ইংরেজ আমলে গুলী চললেই ভারতবর্ষ শোকে মুহ্যমান হ'য়ে পড়ত। আর পাকড়াশীদা'রা যখন গুলী চালান তখন নলিনীদা পর্যন্ত একটা জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লেখেন না ! রাজনীতি-বিজ্ঞান শিখবার জন্য মুখুজ্জেমশাই বই পড়েননি, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখেই শিখে ফেলেছেন সব। তিনি চাঁপ-কাঠের সিংহাসনে ব'সে বললেন, “ভাই সদানন্দ, তোমার বক্তব্য এবার শুনি।”

সদানন্দ মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে বলতে লাগল, “আপনাদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনারা। জম্বুদ্বীপের মতো একটা কংক্রিটের জগতে আপনারা বিংশ শতাব্দীর একটু ধুলো-মাটি নিয়ে এসেছেন ব'লে আমি কৃতজ্ঞ। লোক পাঠিয়ে আগেই আমি লেবরেটরির মূল যন্ত্রটিকে বিকল ক'রে দিয়েছিলাম। আমি এবং আমরা একবিংশের প্রতিক্রিয়াশীলতা

অপছন্দ করি। আমরা বিশ্বাস করি, প্রগতি এখন পেছনদিকে। জম্বুদ্বীপ ঘুরে আসুন, দেখবেন, পথে-ঘাটে কিংবা অফিস-আদালতে কোথাও একটি স্ত্রী-চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে না। সবাই গিয়ে আবার হাঁড়ি আর হেঁশেলের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক পাতিয়েছেন। দীর্ঘ এক শত বৎসর কাল একটি মেয়েও আর ঘরে ছিলেন না। সকালবেলা স্নান শেষ ক'রে অফিস-আদালতের দিকে বেরিয়ে যেতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব বাইরে শেষ করতেন। সংসার কিংবা গৃহস্থবাড়ি ব'লে আলাদা কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখন দেখুন, হাওয়া আবার কিরকম বদলে গিয়েছে। কোনো কোনো সুন্দরী মহিলা বোরখা প'রে মাঝে-সাঝে হাট-বাজারে সওদা কিনতে আসেন। হাঁড়ি কিংবা হেঁশেলের বিরুদ্ধে একটি কথা বললে, সদলবলে তাঁরা প্রতিবাদ করেন। একবিংশতে এঁরাই হচ্ছেন প্রগ্রেসিভ।"

"একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—" প্রহস্তনারায়ণ সদানন্দের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, "কোনো কোনো মেয়ে বোরখা প'রে পথে বেরোন তার কারণ, জম্বুদ্বীপে মেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম। একশোটি পুরুষের অনুপাতে মাত্র পাঁচটি ক'রে মেয়ে। অতএব, পথে একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখতে পেলে কমের পক্ষে শ'-দুই পুরুষমানুষ তাঁর পিছু নেয়। গোটাকয়েক বড়রকমের মারপিট হ'য়ে গিয়েছে। কোনো আদর্শকে ধ'রে রাখবার জন্য তাঁরা একবিংশ শতাব্দীতে হেঁশেলে গিয়ে পুনরায় প্রবেশ করেননি। তা ছাড়া এখন আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। উৎপাদনের গুরুত্ব খুব বেশি ব'লেই তাঁরা আর যখন-তখন ঘাড়ে ব্যাগ ঝুলিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের আসনগুলো দখল ক'রে বসেন না।"

মিষ্টি হাসি সদানন্দের মুখে। সে বলল, "প্রতিক্রিয়াশীলতার চূড়ান্ত নিদর্শন! সামাজিক অবস্থা অনুসারেই মানুষের অভ্যাস

এবং আদর্শের সৃষ্টি হয়। এক শত বৎসর পূর্বে সমাজতান্ত্রিকতার ওপর যে-সব বই লেখা হয়েছে তা থেকে ফরমুলা নিয়ে দেশ শাসন করবার অর্থ কি? জম্বুদ্বীপে একটিও মানুষ নেই। সবাই বৈজ্ঞানিক-পুতুল! আপনারা এসেছেন, এবার বিংশ শতাব্দীর গোটাকয়েক কুসংস্কার আপনাদের কাছে ভিক্ষা চাইব আমরা। জম্বুদ্বীপে কারো কুসংস্কার নেই। আপনারাই বলুন, কুসংস্কার ছাড়া মানুষ কখনো মানুষের মতো বাঁচতে পারে? জবাব দিন—"

দুলাল বললে, "কু কথাটার অর্থ হচ্ছে খারাপ। খারাপ জিনিস মানুষ তো বর্জন করবেই। এর মধ্যে জটিলতা কই? জবাব দেওয়ার কি আছে? আপনার কথা শুনে, আমার ইচ্ছে করছে আদিপ্রকৃতির মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাই। এমনকি গণ্ডারের সঙ্গেও হাত মেলাতে রাজী আছি আমি।"

গজানন মুখুজ্জে দেখলেন, ঝড় উঠবার পূর্বাভাস। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি চাও এখন? শুধু গুটিকয়েক কু-সংস্কার আর খানিকটা ধুলোমাটি পেলেই কি বিপ্লব বন্ধ ক'রে দেবে? তাও তো দুলালের রোমকূপ পরিষ্কৃত হওয়ার পর যন্ত্রটি বিকল হ'ল। আমিও অর্ধেক পরিষ্কৃত। বিংশ শতাব্দীর পুরোটুকু শুধু আমার কন্যাই বহন কবছে।"

সদানন্দ বলল, "আমরা চাই রাজতন্ত্র।"

শামিয়ানার তলায় যেন একটা হাইড্রোজেন-বোমা নিপতিত হ'ল! বিশুদ্ধ অর্থবিজ্ঞানের পণ্ডিত শুভংকর সেনগুপ্ত লজ্জায় এবং ঘৃণায় প'চে উঠলেন। সভাস্থল ত্যাগ করলেন তিনি। প্রতিরক্ষা-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টার জহ্লাদ প্রামাণিক স্ট্রেচারে শুয়ে নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে রাখলেন। দুলাল একেবারে পুরোপুরি ক্ষেপে উঠল। চাঁপ-কাঠের চেয়ারটাকে একদিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল, "বেশ, তা হ'লে এই 'ইস্যু'তে নির্বাচনের ব্যবস্থা হোক। দেশের লোক যদি রাজতন্ত্র চায়, আমি আবার বিংশ শতাব্দীর বন্দরে ফিরে

যাব। আর যদি আমরা জয়লাভ করি, তা হ'লে আপনাকে আমরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে রাখব। রাজী?"

"রাজী।" জবাব দিল সদানন্দ।

পটলী বলল, "দুলুদার সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি। নির্বাচনে হেরে গিয়ে ভারতবর্ষের কোন্ মানুষটা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে গিয়ে বাস করেছে শুনি?"

শামিয়ানার তলায় গুমোট-মারা উত্তেজনা! গজাননবাবু বললেন, "বেশ, নির্বাচনেব প্রস্তাবই পাকা হ'ল। সভা এবার ভঙ্গ হোক। নন্দ, আজ বিকেলে আমার ওখানে তোমার চা-এর নেমন্তন্ন রইল। কি বলিস পাটুল?"

"হ্যাঁ, বাবা। তোমার ভদ্রতা তুমি বজায় রাখলে।"

সদানন্দ বলল, "আমার তপোবনটাও একবার এসে দেখে যাবেন আপনারা।"

"তপোবন?" হেসে উঠল দুলাল, "হামবাগ্!"

॥ চাব ॥

রকেট-বন্দর থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টাবের সরকারী-কুঠি প্রায় দশ মাইল দূব। মোটরগাড়িতে চেপে বসলেন ওঁরা। সঙ্গে রইলেন প্রহস্তনারায়ণ। ড্রাইভারের পাশের আসনটি দখল করলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, "কতো মাইল স্পীড্ দেবে গাড়িতে?"

"পঞ্চাশ-ষাট—" জবাব দিলেন গজাননবাবু।

"এখানকার স্পীড্-লিমিট হচ্ছে একশো। আপনাদের মহানগরীতে যেমন গতির মুখ বেঁধে দেওয়া হয়, এখানে ঠিক তার উল্টো। একশো মাইলের কমে যদি গাড়ি চলে তা হ'লে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার ভয় থাকে। একশো পঁচিশ মাইল বেগেই চলুক।"

বেশ চওড়া রাস্তা। দু'তিনখানা গাড়ি পাশাপাশি চলতে পারে। যাচ্ছেও তাই। কিন্তু কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। গতি এতো দ্রুত যে, পাশ দিয়ে একটা গাড়ি বেরিয়ে গেলে মনে হয় যেন গাড়ি নয়, হাওয়া। দুলাল মন্তব্য করল, "ভারি মজা তো! উল্টো দিক থেকে যেন ফুস ফুস ক'রে এক-একটা কালবোশেখী পাস্ করছে। একশো মাইল করুন দাদা, আশ-পাশটা দেখি।"

পটলী বলল, "সদানন্দবাবুর সঙ্গে তুমি গরুর-গাড়িতে এলে পারতে, দুলুদা।"

সদানন্দের নাম করতেই দুলাল গম্ভীর হ'য়ে গেল।

কোলাহল কিংবা হৈ-চৈ কোথাও নেই। দশ মাইলের মধ্যে একটা গরু কিংবা নেড়ীকুত্তাও চোখে পড়ল না। গজাননবাবু ভাবলেন, জম্বুদ্বীপের আসল সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যার অভাব। চাহিদা অত্যন্ত কম, অথচ উৎপাদন খুবই বেশি। শ্রমিকদের মাত্র তিন ঘণ্টা ক'রে কাজ করতে হয়। তাতেও উৎপাদনের অর্ধেক মাল পুড়িয়ে ফেলেন এঁরা। পুরো দেশটাই কলকব্জার ওপর নির্ভর করছে। পাকড়াশীদা'র কথা মনে পড়ল গজাননবাবুর। পূর্ববঙ্গের রিফিউজীদের নিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন তিনি। জম্বুদ্বীপের অভাব তিনি মিটিয়ে দিতে পারেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের রিফিউজী-সমস্যাও মেটে। গজাননবাবু স্থির করলেন, পাকড়াশীদাকে একটা ডেলিগেশন নিয়ে এখানে আসবার জন্য খবর পাঠাবেন। শতকরা পাঁচ জন পুরুষ আর পঁচানব্বই জন স্ত্রীলোকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অনায়াসেই হ'তে পারে। শুধু একটু টেক্‌নিক্যাল অসুবিধা ঘটবার সম্ভাবনা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর মনোভাবাপন্ন রিফিউজীরা একবিংশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারবে কিনা। না পারবার কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দণ্ডকারণ্যের মতো জায়গায় গিয়ে তারা যদি প্রত্নপ্রস্তরযুগ

থেকে শুরু করতে পারে, তা হ'লে একবিংশের বিজ্ঞান-প্রান্তরে এসে মাথা গুঁজতে পারবে না কেন? চেষ্টা করলে পূর্ববঙ্গের লোকেরা সব পারে। এমনকি এখানে পৌঁছেই জম্বুদ্বীপের বুকের ওপব সাইনবোর্ড লট্‌কে দিতে পারে: আদি পূর্ববঙ্গ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়তো ডেলিগেশন আসবে, রিফিউজীরা আসবে না। রাজনীতির জোয়ার-ভাঁটার ওপর ওদের জীবন-নৌকো ভেসে চলেছে। এগুবে, না পেছুবে, তা বোধহয় ওরা নিজেরাও জানে না।

ম্যানেজিং ডিবেক্টারেব বাড়ির সামনেও বাগান নেই। গাছ-পাতা লাগিয়ে এক ইঞ্চি জমিও এঁরা নষ্ট করেননি। বনমহোৎসবের ইয়ার্কি শুধু মহানগরীতেই চলে। কাজ নেই তো খৈ ভাজ। সুন্দর অট্টালিকা! একেবারে রাস্তাব ওপর থেকেই শির উঁচু ক'রে ওপবদিকে উঠে গিয়েছে। প্রবেশপথের মুখে সোনার ফলকের ওপর লেখা রয়েছে: শ্বেত-কুঠি। ফলকের ওপর হাত রেখে দুলাল ঘোষণা করল, "জীবনে এই প্রথম খাঁটি সোনা ছুঁয়ে দেখলুম, গজুদা!"

"দুলু, ইতিহাস ভুলে যাস্‌নি। বাগনানের টিনের চালা থেকে বেরিয়ে একেবাবে শ্বেত-কুঠির কোলে এসে পৌঁছে গেলি।"

প্রহস্তনারায়ণের দিকে চেয়ে দুলাল জিজ্ঞাসা করল, "আমি কোথায় থাকব? এটা কি আমারও অফিসিয়েল বাসভবন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের নিচে। আপনার ঠিকানা হচ্ছে, নবতিতম তলা। তার ওপর থেকে সব-ক'টা তলাই মুখুজ্জে-মশায়ের সরকাবী বাসভবন। সিঁড়ি কিংবা লিফ্‌ট্‌ ব'লে কিছু নেই। প্রত্যেকটা ঘরের সামনে একটা ক'রে 'উত্তোলক' আছে। দেখতে অনেকটা পাল্‌কির মতো। স্বয়ংক্রিয়। ওঠায়, আবাব নামায়ও। দু'চার দিন আপনাদের একটু অসুবিধে হবে। বিংশ শতাব্দীর নিম্নস্তর থেকে একবিংশের উচ্চতায় উঠে এসেছেন। মাঝে-সাঝে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে প'ড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। চলুন, আপনাদের ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

শ্বেত-কুঠির ভেতরে ঢুকে তাক্ লেগে গেল ছুলালের। এলাহী ব্যাপার! উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনো পথই এঁরা আটকে রাখেননি। বদ্ধ উন্মাদের পক্ষেও যা কল্পনা করা অসম্ভব তাও এখানে আছে। চওড়া একটা বারান্দা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে প্রহস্তনারায়ণ একটা সুইচ টিপলেন। একটা গোল টেবিলের ওপর প্রচুর প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য এসে উপস্থিত হ'ল। গপাগপ্ ক'রে খেতে লাগল ছুলাল। গজাননবাবু আর পট্‌লীও খেতে ব'সে গেল। সেই 'বিংশ শতাব্দী' থেকে শুধু এক পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন, তারপর 'একবিংশ'তে পৌঁছে খাদ্যের সঙ্গে প্রথম এঁদের যোগাযোগ ঘটল।

খেতে খেতে প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠল ছুলাল। বললে সে, "গজুদা, ঐ ছাখো, মদ্‌না আমাদের টেবিল পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না।"

সত্যিই তাই। হাঁটতে গেলেই পিছলে পড়ছে মদন। শ্বেত-কুঠির মেঝে এতো বেশি মসৃণ যে নিচের দিকে চেয়ে মাথার চুল আঁচড়ানো চলে। ঘন মসৃণতার জন্য মেঝেটা তৈলাক্ত মনে হয়। মদন পৌঁছতে পারল না। মেঝের ওপর ব'সে নিজের চেহারা দেখতে লাগল সে।

'উত্তোলক'এর সাহায্যে ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন সবাই।

প্রহস্তনারায়ণ বিদায় নিলেন। ব'লে গেলেন, "নির্বাচন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন আপনারা। চব্বিশ ঘণ্টা পরে ভোট দেওয়ার দিন ধার্য হ'ল।"

গজাননবাবু বললেন, "আমি তো ছু'দিকেরই ক্যান্‌ডিডেট। লড়াই করবে ছুলাল আর সদানন্দ। হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টার হবো, নয়তো রাজা হবো। ছুলাল, তুই একদিন আমার হাত দেখে বলেছিলি, মাথায় আমার রাজমুকুট বসবে।"

"সে তো আন্দাজে গুল্ মেরেছিলুম, গজুদা।"

"তোর গুল্ পর্যন্ত সত্যি হ'তে চলেছে রে। ভালো ক'রে

ক্যান্‌ভাস কর। প্রত্যেকের দরজায় দরজায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।"

প্রহস্তনারায়ণ বললেন, "ভয় পাবেন না, তুলালবাবু। জম্বুদ্বীপের জনসাধারণের মধ্যে একশো জনই শিক্ষিত। সদানন্দ নিজের ফাঁদ নিজেই ফেঁদেছে। সত্যিই আপনি কূটনীতিজ্ঞ, তুলালবাবু। ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন। চলি এবার। আপনাকে নিয়ে তুপুরবেলা বেরুব। আজ থেকেই ভোট-ভিক্ষার আয়োজন করতে হবে।"

নবতিতম তলায় পৌঁছে গেল তুলাল। দরজার সামনে একটি মহিলা অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, "আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমার পুরো নাম লোপামুদ্রা। আপনি লোপা ব'লে ডাকবেন।"

আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে গেল তুলাল। ঠিকানায় পৌঁছেই হাতের কাছে লোপামুদ্রা! বেড়ে ব্যবস্থা তো। মাঝপথে গপ্ গপ্ ক'রে প্রোটিন খেতে ব'সে সময় নষ্ট করার দরকার ছিল না। পটলী যদি সদানন্দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়, তুলাল তা হ'লে লোপামুদ্রার দিকে ঝুঁকে বসবে। এ বাবা প্রেমের ত্রিভুজ নয়, চতুর্ভুজ। চাপা আনন্দে তুলাল কয়েক মিনিট কথা বলতে পারল না। যতোবারই কথা বলতে যায়, প্রতিবারেই গলা দিয়ে অর্থহীন আওয়াজ বেরোয় শুধু। যে-দেশে শতকরা মাত্র পাঁচ জন মেয়ে, সেখানেও একজন মহিলা প্রাইভেট সেক্রেটারি পেয়ে জম্বুদ্বীপের প্রেমে পড়ল তুলাল। হাত বাড়িয়ে লোপামুদ্রার সঙ্গে করমর্দন করতে গেল সে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর। লোপামুদ্রা হাসতে হাসতে বলল, "ভয় নেই, ডি-সি কারেণ্ট। এ শুধু ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সরকারী দপ্তরে আমরা যে-ক'টি মেয়ে চাকরি করি, বাড়ি থেকে বেরুবার সময় বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত শাড়ি প'রে আসি।"

'ভয় নেই, ডি-সি কারেণ্ট।'

"ভারি সুন্দর ব্যবস্থা তো—" মেঝে থেকে উঠে পড়ল দুলাল, "এ-সি কারেণ্ট হ'লে তো মারা পড়তুম আজ !"

"আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই এমন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আগে এ-সি কারেণ্ট-ই ছিল। একদিন দুপুরবেলা আমাদের ভূতপূর্ব জেনারেল ম্যানেজার রায় সাহেব কি মনে ক'রে আমায় আলিঙ্গন করতে গেলেন—"

"তারপর ?" জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল দুলাল।

"তারপর যা হওয়ার তাই হ'ল। বিজ্ঞান তো কাউকে ক্ষমা করে না। প্রায় এক সেকেণ্ড পর্যন্ত লেপ্টে রইলেন। বৃদ্ধ হেড-ক্লার্ক সেই সময় হঠাৎ ঢুকে পড়লেন ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেইন সুইচটা বন্ধ ক'রে দিলেন। সেই যাত্রায় রায় সাহেব বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু হেড-ক্লার্কের চাকরি গেল।"

"কেন ?"

"মেইন সুইচটা অতো তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন ব'লে। তারপর থেকে ডি-সি বিদ্যুৎ চালু করেছি আমরা। এখন শুধু ধাক্কা মেরে-মেরে ফেলে দেয়। আপনি এবার একটু বিশ্রাম করুন। ঘণ্টা-দুই পরে আবার আসব।"

"একটু দাঁড়াও, লোপা—" নতুন চাকরিতে যোগ দিতে এসে প্রথমেই বিদ্যুতের শক্ খেয়েছে দুলাল। গোড়াতেই ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। সে বলল, "তোমার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে তুমি প্রাইভেট সেক্রেটারি নও। বুড়ো রায় সাহেব কি করেছিলেন আমার জানবার দরকার নেই। বিদ্যুৎ-সঞ্চারিত জামা-কাপড় কি পরিত্যাগ করতে পারো না ?"

"অসম্ভব। সামাজিক অবস্থা অনুসারেই এদেশের সব-কিছু পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াশীলতার ব্যাধিতে কেউ এখানে ভোগে না।"

"ধরো যদি তোমার নিরাপত্তার জন্য বারো জন দারোয়ান নিয়োগ করি ?"

"দাবোয়ানদেরও বিশ্বাস করা চলবে না।"

"কতো টাকা মাইনে পাও, লোপা ?"

"তিন হাজার টাকা।"

"আমি আরও হাজার-তুই বাড়িয়ে দেবো। বাড়ি থেকে আর বিত্যুৎ ব'য়ে এনো না, লক্ষ্মীটি। তোমার নিজের গায়ে শক্ লাগে না ?"

"আমরা শক্-প্রুফ।"

লোপামুদ্রা আঘাত পেল খুব। লোকটি তো প্রতিক্রিয়াশীলতার ডিপো। এরই অধীনে প্রত্যেকদিন কাজ করতে হবে ওকে। গোড়া থেকেই ন্যাকামি শুরু করেছে। এতোকাল ওর ধারণা ছিল অবিবাহিত লোকরাই কর্মজীবনে উৎপাত করে কম। সেই ধারণা বোধহয় আর টিকবে না। এব অধীনে চাকরি করতে হ'লে বিত্যুতের ভোল্টেজ বাড়াতে হবে। বৈত্যুতিক চালকশক্তির মোট পরিমাণ অন্তত চারশো চল্লিশ হওয়া দরকার। সে বলল, "আমি শুনেছিলুম, পাটুল দেবীর সঙ্গে আপনার বিয়ের প্রস্তাব পাকা হ'য়ে আছে। কথাটা কি সত্যি নয়, মিস্টার দত্ত ?"

"সে তো গত শতাব্দীর পুরনো কথা।—চললে ?"

"হ্যাঁ।"

"অতো বড় একটা শক্-এর পরে তেষ্টা পেয়েছে খুব।" তুলালের সরু বুকটা এখনো ধুকপুক করছিল।

লোপামুদ্রা বলল, "বিছানার পাশেই দেখবেন স্টেথেস্কোপের মতো তুটো নল প'ড়ে রয়েছে। একটা দিয়ে গরম, অন্যটা দিয়ে ঠাণ্ডা জল আসবে। কষ্ট ক'রে মুখে লাগিয়ে একটু টানতে হবে। বেলা তুটোতে আবার আসব।"

চ'লে গেল লোপামুদ্রা। বিছানায় শুয়ে নিজের কপালে

করাঘাত করতে লাগল দুলাল। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট সেক্রেটারির হাত ধরতে যাওয়া উচিত হয়নি। নমস্কার বিনিময় করলেই তো হ'ত। ঝপ ক'রে এতোটা বেশি এগিয়ে যাওয়া অন্যায় হয়েছে। মহানগরীর হাওয়া গিললে বোধহয় মনটা সব সময়ই ভাবপ্রবণ হ'য়ে থাকে। শেষের দুটো বছর অত্যধিক কবিতা পাঠ করেছে দুলাল। বাংলার জল আর বাংলার মাটি যে কী সাংঘাতিক ভাবপ্রবণ পদার্থ তা শুধু ঐ অঞ্চলের লোকেরাই জানে। একটা 'শীর্ষ-সভা'র মতো বৃহৎ ব্যাপার বোধহয় ভেঙে গেল!

শ্বেত-কুঠিতে ঢুকবার পরেই মদনের জীবন অসহনীয় হ'য়ে উঠেছে। জম্বুদ্বীপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে কোনো কথাই বোঝানো যাচ্ছে না ওকে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করছে, আর আধ-পাকা শিং বাঁকিয়ে দেয়ালের গায়ে গুঁতো মারছে শুধু। বেলা দুটোর মধ্যেই আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের গুঁতোয় কয়েকটা দেওয়ালের আস্তর খ'সে পড়েছে। মদন বাস করছিল একষট্টিতম তলায়। খবর পেয়ে দুলাল উত্তোলকে চেপে নেমে এলো নিচে। ছি ছি, এ যে রক্তপাতের বিপ্লব! বেচারা সত্যি-সত্যি প্রতিবাদের শিং ব্যবহার করেছে। দূর থেকে নিরাপদ জায়গায় ব'সে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা ওড়াবার আদেশ দেয়নি সে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্মুখে রয়েছে মদন। সবে-পেকে-আসা শিংএর গোড়া থেকে রক্ত পড়ছিল। গণ্ডারের দেহ থেকে যে রক্ত পড়তে পারে তেমন কথা কোনোদিনও মনে হয়নি দুলালের।

স্বয়ংক্রিয় দ্বিতীয় উত্তোলকে চেপে সদানন্দ চা-এর নেমন্তন্ন রক্ষা করবার জন্য উর্ধ্বদিকে উঠছিল। গণ্ডার এবং দুলালকে দেখতে পেয়ে মাঝপথে যাত্রা ভঙ্গ করল। জিজ্ঞাসা করল সদানন্দ, "কি হয়েছে?"

"কি আর হবে, বন্দীজীবন যাপন করতে চাইছে না তরুণ গণ্ডার।" বলল দুলাল।

"এমন সুন্দর পরিবেশ, তবুও বুঝি নিজেকে কয়েদী ভাবছে ?"

"হ্যাঁ। প্রথমশ্রেণীর কয়েদী হ'তেও সে চায় না। হ্যাঁ মশাই, আপনার তপোবনে কি নটে-শাক জন্মায় ? কিংবা অন্য কোনো শব্জি ?"

ওষুধপত্র নিয়ে দুজন পুরুষ-নার্স এসে উপস্থিত হ'ল। মদনকে ধ'রে রাখল দুলাল। তারপর নার্স দুজন ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসল। মদন তার দেহটাতে এমনভাবে একটা মোচড় দিল যে, নার্স দুজন ছিট্‌কে পড়ল দু'দিকে। দুলাল বলল, "আপনাদের ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে দেবে না। দিন, আমাকে দিন। মেয়ে-নার্স দেখে দেখে মদনের অভ্যাস কিনা।"

গম্ভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে দুলাল নিজেই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বসল।

গজানন মুখুজ্জে রাজা-সাইকোলজিতে ভুগছেন। সত্যি সত্যি তিনি ভাবছেন যে, জম্বুদ্বীপের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া আশু প্রয়োজন। জম্বুদ্বীপ আর ভারতবর্ষের মধ্যে এক শতাব্দীর ব্যবধান। ওখানে যা প্রতিক্রিয়াশীল, এখানে তাকে প্রগতিশীল বলা হয়। এমন একটা সুন্দর দেশের বায়ু টেনে টেনে গজাননবাবু ইতোমধ্যেই রাজা ব'নে গিয়েছেন। রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা দেখা করতে এসেছিলেন। কারো সঙ্গেই দেখা করলেন না তিনি। খবর পাঠালেন, নির্বাচনের পরে একেবারে রাজসভায় গিয়ে বসবেন। প্রজাবৃন্দ সেই সময় তাঁর দর্শনলাভের সুযোগ পাবে।

সমস্তটা দুপুর ঘুমতে পারলেন না। সিংহাসনের ডিজাইনটা কিরকম হবে সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। সমস্যা একটা নয়, অনেক। সিংহাসনে বসবার জন্য আলাদা পোশাক চাই। রাজ-মুকুটের অর্ডার দেওয়াও দরকার। দুলালকে দিয়ে একটা মুখুজ্জে-

বংশের ইতিহাস লেখাতে হবে। অন্ধকার অতীতের মাটি খুঁড়ে নানাবিধ ঘটি, বাটি এবং কলসীর ভগ্নাংশ থেকে প্রমাণ করতে হবে যে, মুখুজ্জেরা এককালে রাঢ়দেশের রাজা ছিলেন। দুলালের মতো পণ্ডিত ছাড়া এতোবড় গবেষণার কাজ অন্য কেউ আর পারবে না। কয়েক শতাব্দীর 'ব্লাড-ব্যাঙ্ক' খুঁজে রক্তের কৌলীন্য উদ্ধার ক'রে আনা বড় সোজা কথা নয়। দুলালই পারবে এই অসাধ্য সাধন করতে। পুরস্কারস্বরূপ দুলালকে তিনি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন।

তিনি যখন এইসব সমস্যা নিয়ে মগ্ন হ'য়ে আছেন, পটলী তখন অন্য কামরায় ব'সে সদানন্দকে চা খাওয়াচ্ছে। নিজে আর খাচ্ছে না কিছুই। শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সদানন্দের স্বাস্থ্য দেখছে। মানুষ, না টালিগঞ্জের ফিল্ম-স্টার?

পটলী জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের স্টুডিয়োটা এখান থেকে কতোদূর?"

"স্টুডিয়ো নয়, তপোবন, পাটুল দেবী।" হাসতে গিয়ে সদানন্দের বাঁ গালে টোল পড়ল। কমলালেবুর কোয়ার মতো ঠোট দুটো রক্তে টইটুম্বুর। একটা আলপিন ছুঁইয়ে দিলে বোধহয় ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুবে। এমন জিনিস তপোবনেই জন্মায়। আঙুরের স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে সদানন্দ বলল, "এখান থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে। যাবেন আমার তপোবন দেখতে?"

"আর কে কে আছেন ওখানে?"

"কেউ না। আমি মাতৃপিতৃহীন। ভাইবোন নেই। দুটো হরিণ আমায় সঙ্গ দেয়।"

"হরিণ?" পটলী একেবারে হেলে-দুলে পুলকোচ্ছ্বাসে অস্থির হ'য়ে উঠল, "হরিণ? আমি হরিণ খুব ভালবাসি। আমায় আপনি নাম ধ'রে ডাকবেন। গণ্ডার দেখে দেখে আমার সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হ'য়ে গেল! নন্দদা, তোমার তপোবনে কবে নিয়ে যাবে আমায়?"

"আজই চলো।"

"গরুর-গাড়িতে কতোক্ষণ সময় লাগবে? স্লো গাড়ি আমার খু—ব পছন্দ। ঐ ছানার চপ্‌খানা খাও, নন্দদা!"

সদানন্দ পট্‌লীর কোনো অনুরোধই উপেক্ষা করল না। টেবিলের ওপর যা ছিল, সবই খেয়ে ফেলল। জম্বুদ্বীপ হচ্ছে প্রোটিনের রাজ্য। সদানন্দ বলল, "এখানে কেউ খেতে ব'সে সময় নষ্ট করে না। পথে-ঘাটে হাত বাড়ালেই প্রোটিন। আমরা মোটরে চেপে যাব। গরুর-গাড়িটা আমি প্রতীক হিসেবে চালাই। যাবে এখন?"

"তোমার সময় নষ্ট হবে না? কাল বাদে পরশুই তো নির্বাচন?"

"কাল সকাল থেকে কাজ আরম্ভ করব। চব্বিশ ঘণ্টাই যথেষ্ট।"

"একটু বোসো, বাবাকে ব'লে আসি।"

পট্‌লী ছুটতে ছুটতে চ'লে এল গজাননবাবুর ঘরে। এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। জিজ্ঞাসা করল, "এ কি করছ, বাবা?"

"রাজমুকুটের একটা নকশা তৈরি করছি।" ঘরের মেঝেতে হাজার হাজার কাগজের টুকরো প'ড়ে রয়েছে। দুজন পরিচারক গাদা গাদা পুরনো সংবাদপত্র সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছে ঘরে। মুখুজ্জেমশাই সংবাদপত্র কেটে কেটে রাজমুকুটের ডিজাইন তৈরি করছিলেন। একটাও পছন্দ হচ্ছে না।

"তোমার মনোযোগ আমি নষ্ট করতে চাইনে, বাবা। ওরা তোমায় আরও সংবাদপত্র এনে দেবে। নন্দদার সঙ্গে আমি তপোবন দেখতে চললুম।"

"দেরি ক'রে ফিরিস, মা। একটু ব্যস্ত আছি আমি।"

প্রহস্তনারায়ণ দুটোর সময় ফিরে এলেন। বললেন তিনি, "এক মিনিটও নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের নেই। ভোটের কাজ এখনই শুরু করতে হবে। আমাদের অস্থায়ী জেনারেল ম্যানেজার সারা দেশময় বিজ্ঞপ্তি প্রচার ক'রে দিয়েছেন।

"রাজমুকুটের একটা নকশা তৈরি করছি।"

জনসাধারণকে অনুরোধ জানিয়েছেন : আপনারা দলে দলে এসে ভোট দিন।"

দুলাল বলল, "মদনকে নিয়েই মুশকিলে পড়লুম। শিংটা একটু জখম হয়েছে।"

"উদ্ভিন্ন যৌবন, তাড়াতাড়ি ঘা শুকিয়ে যাবে।" বললেন প্রহস্তনারায়ণ।

"ভারতবর্ষের বীজাণুপুষ্ট হাওয়া লাগলে তাড়াতাড়ি শুকত—বিষে বিষক্ষয়। মদনকে একা ফেলে যাওয়া চলবে না। ও বরং লোপা দেবীর কাছে থাক।"

লোপামুদ্রা কাছেই ছিল। সে বলল, "আমার তো তিনটে পর্যন্ত ডিউটি—"

"রাষ্ট্রের এই সঙ্কটমুহূর্তে ঘড়ি মিলিয়ে ডিউটি দিলে চলবে কেন? ওভারটাইম খাটতে হবে, লোপা দেবী। ঐ ছ্যাখো, মদন তোমার গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে! অথচ পাটুল দেবীকে দেখলেই প্রতিবাদ জানায়। গলা দিয়ে অপ্রীতিকব আওয়াজ বার করে। ঘণ্টা-দুয়েব মধ্যেই ফিরে আসব আমবা।"

লোপামুদ্রা তবু বলল, "আমি তো গণ্ডারের প্রাইভেট সেক্রেটারি নই—"

"জানি, লোপা দেবী। ঘণ্টা-দুই মদনের সঙ্গে বাস করলেই বুঝতে পারবে, এ-সি এবং ডি-সি দু'বকম বিদ্যুৎই সে শুষে নিয়েছে। ওর বিশোষণের ক্ষমতা অসাধারণ। চলুন প্রহস্তনারায়ণ-বাবু, আমরা যাই। সদানন্দ স্লোগান দিচ্ছে কী?"

"স্পিরিচুয়্যাল স্লোগান। রাজা ছাড়া ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে না। মার্চ টু অযোধ্যা।"

"ফক্কড় আর কাকে বলে!" উত্তোলকে উঠে বসল দুলাল। প্রহস্তনারায়ণও দ্বিতীয় উত্তোলকে চাপলেন। শ্বেত-কুঠির শূন্যতার মধ্যে দিয়ে নামতে লাগলেন নিচে। পথটা আলোকিত। হঠাৎ

নিচের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই দুলাল দেখতে পেল, সদানন্দ আর পট্‌লী একই উত্তোলকে বেশ ঘন হয়ে বসেছে। ওরাও নিচে নামছিল। ভোটগণনার আগেই দুলাল হেরে গেল নাকি?

জীবনের স্টুডিয়ো তপোবনের চেয়ে সুন্দর হওয়া সম্ভব নয়। প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ল পট্‌লী। জনার্দনপুরে লালিত-পালিত হয়েছে সে। গাছপাতা কিছু কম গ্যাখেনি। কিন্তু তপোবনের মতো এমন শান্ত, স্নিগ্ধ এবং পবিত্র পরিবেশ জনার্দনপুরে ছিল না। পট্‌লী জিজ্ঞাসা করল, "মানব-সভ্যতার শুরু কি এই তপোবন থেকেই?"

"না। জম্বুদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসে শুরুটা খুঁজে পাওয়া যায়।"

"ইতিহাসেব গল্প শুনতে আমার খু—ব ভালো লাগে, নন্দদা।"

বাগানের মধ্যে ঘাসের ওপর বসল ওরা। হরিণ দুটো ফটকের কাছে অপেক্ষা করছিল। অনেকদূব থেকে সদানন্দের আগমনধ্বনি শুনতে পায় ওরা। সদানন্দ আব পট্‌লীর মাঝখানের জায়গাটুকু দখল ক'রে ওরাও ইতিহাস শুনতে বসল।

সদানন্দ বলতে লাগল, "বহু সহস্র বৎসর আগে জম্বুদ্বীপে এক রাজা রাজত্ব করতেন। কী তাঁব নাম ছিল কেউ জানত না। সবাই তাঁকে শুধু রাজা ব'লেই চিনত। তিনি রাজত্ব করছিলেন কতো সহস্র বছর ধ'রে তাও বলা মুশকিল। কারণ, পুরুষানুক্রমে সবাই দেখত, রাজার বয়স বাড়ে না। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। রাজকন্যা। রূপে গুণে সে ছিল অদ্বিতীয়া। সেই সময় জম্বুদ্বীপের সভ্যতা আজকের চেয়েও বেশি বৈজ্ঞানিক ছিল। সারা দেশময় বিশেষজ্ঞ আর বিশেষজ্ঞ। যে চুল বাঁধে সে রান্না করে না। যে গাড়ি চালায় সে পথঘাটের গর্ত কিংবা আশপাশের গাছ দেখে না। গতির মুখে গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেলে সে বলত, 'আমি কি

করব, গাছের খবর আমি রাখি না, ও তো উদ্ভিদবিদ্যার সত্য।' কিন্তু গাছটা যে নিজেই একটা সত্য সে ধারণা লোকের মন থেকে মুছে গেল। সেই রাজা মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞদের রাজসভায় আমন্ত্রণ ক'রে ডেকে এনে বলতেন, 'রাজা শুধু রাজতন্ত্রের সত্য নয়, আমি নিজেই সত্য।' বিশেষজ্ঞরা কথাটার অর্থ বুঝতে পারতেন না। তারপর একটা মস্ত বড় দুর্ঘটনা ঘটল। একদিন রাজপ্রাসাদের বাগানে রাজকুমারী আলবালে জল-সেচন করছিল। এযাবৎকাল জম্বুদ্বীপের বিশেষজ্ঞ জনসাধারণদের মধ্যে কেউ তাকে দেখতে পায়নি। সবাই জানত রাজকন্যা অসামান্যা সুন্দরী। অনেকে তার সৌন্দর্য নিজেদের অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে মাঝে মাঝে অনুভব করত। কবি এবং শিল্পীরা কল্পনায় তাকে কেন্দ্র ক'রে বিশ্বসৌন্দর্যের স্বাদও নাকি পেতেন। হরিবর্ষের রাজকুমার সেই সময় রাজকুমারীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চোখ বন্ধ ক'রে রূপের সমুদ্রে অবগাহন করতে লাগল সে। ইতিমধ্যে জম্বুদ্বীপের চারজন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ এসে উপস্থিত হ'ল সেইখানে। একজন বললে, 'আহা, রাজকুমারীর কেশরাশি কী সুন্দর!' দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, 'আমি তো রাজকন্যার চোখের সঙ্গে প্রেমে প'ড়ে গেলুম।' তৃতীয় জন ঘোষণা করলে, 'ওর হাত দু'খানা পেলে আমি আর কিছুই চাই না।' চতুর্থ বিশেষজ্ঞ রাজকুমারীর পা দু'খানা দেখে অভিমত দিল, 'মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলুম, সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে মাপজোখ একেবারে নিখুঁত। পা দু'খানা পেলে আমিও আর কিছুই চাইব না।' চারটি বিশেষজ্ঞ তখন পথের ধারে ব'সে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করতে লাগল। হঠাৎ ওরা দেখতে পেল, কোথা থেকে একখণ্ড কালো কুচকুচে মেঘ এসে থেমে গেল বাগান আর পথের মাঝখানে। রাজকুমারীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর একটা সোনার থালা এসে ঝুপ ক'রে প'ড়ে গেল প্রথম বিশেষজ্ঞের সামনে। সে

দেখল, থালার ওপর সেই চোখ-দুটি! পর পর আরও তিনটে সোনার থালা এসে পড়ল। রাজকুমারীর চুল, হাত আর পা সবই তাতে আছে। বিশেষজ্ঞরা যখন আকাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে ফুর্তি করছে, হরিবর্ষেব রাজকুমার তখন চোখ খুলল। দৃশ্য দেখে হাহাকার ক'বে উঠল রাজকুমার! একি ব্যাপার! সত্য এবং সুন্দর খণ্ড খণ্ড হ'য়ে গেল? সেই মুহূর্ত থেকে জম্বুদ্বীপের রাজ-প্রাসাদ শূন্য। রাজা নেই, রাজকুমারীও নেই। প্রাসাদের সামনে শুধু একখণ্ড কালো মেঘ ঝুলে রয়েছে। বহু সহস্র বৎসর পার হ'য়ে গিয়েছে, হরিবর্ষের রাজকুমার আজো খণ্ডাকার জগৎ-সংসারে রাজকুমারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীব অন্ধকাব ভেদ ক'রে তার হাহাকার ভেসে ওঠে। সে বলে, সত্য অখণ্ড। সোনাব থালাব ওপর চোখ সুন্দর নয়। রাজকুমারীর সমগ্রতায় সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ। পাটুল, দেখেছ, কান খাড়া ক'রে হরিণ দুটোও গল্প শুনছে?"

"এমন সুন্দর গল্প বোধহয় সারা পৃথিবী শুনেছে! নন্দদা, ভোট-যুদ্ধে তুমি না নামলেও পাবতে।"

"কেন?"

"হরিবর্ষের রাজকুমার আমার বাবাকে আসল রাজা মনে করে না। দুলালবাবুর সঙ্গেও তুমি বিরাট একটা কৌতুকের অভিনয় করছ। আমার বুড়ো বাবাকে নিয়ে এমন ঠাট্টা শুরু করলে কেন? তোমরাই তো তাঁকে ডেকে এনেছ, নন্দদা।"

"পাটুল, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। বহু-খণ্ড-বিশিষ্ট ভূমণ্ডলকে জোড়া দেওয়ার দায়িত্ব নেবো আমরা। ঐ শ্বেত-কুঠিই ভবিষ্যতের রাজপ্রাসাদ।"

ফেরার পথে পাটুল কথা বলল না একটিও। সদানন্দের পাশে ব'সে কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম ক'রে এল। নিজের ঘরে এসে প্রথমেই সে আয়নায় নিজের মুখ দেখতে লাগল। চোখ-দুটো

কি ওর সেই প্রাচীনকালের রাজকুমারীর মতো সুন্দর? আর হাত দু'খানা? কেশরাশি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে মনে মনে বলতে লাগল, "সারাজীবন বোরখা প'রে থাকব, তবু কোনো বিশেষজ্ঞ যেন আমায় দেখতে না পায়।"

বাইরে থেকে দুলাল ডাকল, "পাটুল—"

"এসো, দুলুদা।"

"তপোবন থেকে কখন ফিরলে?"

"কতো সহস্র বৎসর আগে, মনে নেই।"

বিস্ফারিত নেত্রে পটুলীর দিকে চেয়ে রইল দুলাল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ব'লে গেল, "তোমার কথাই বিশ্বাস করলুম, পাটুল।"

॥ পাঁচ ॥

দ্বিতীয় দিনটা বাইরে বাইরে কাটিয়ে দিল দুলাল। শ্বেত-কুঠিতে ফিরে এল না। জম্বুদ্বীপের জনসাধারণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। দুলালের জ্বালাময়ী এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছে সবাই। রেডিয়ো টেলিভিসন মারফত এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের দ্বারা সমাজতন্ত্রের সুখ-সুবিধার কথা প্রচার করেছে সে। সদানন্দের প্রতি লক্ষ লক্ষ যুক্তির বাণ ছুঁড়তেও দ্বিধা করেনি। জম্বুদ্বীপের একঘেয়ে সুখের জীবনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করল দুলাল। প্রয়োজনের দশগুণ অতিরিক্ত যে-দেশে জিনিস তৈরি হচ্ছে সেখানে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যার কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসাধারণ দুলালের মুখ থেকে ব্যাখ্যা শুনবার দাবি জানালো। ভারি মজা লাগছে শুনতে! ঘন ঘন করতালির দ্বারা দুলালকে উৎসাহিত করছে জনসাধারণ। উৎসাহের মাত্রা এতো বেড়ে গেল যে, দুলাল ভুলে গেল, জম্বুদ্বীপ একশত বৎসরের

একটি প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক দেশ। ফলে, বিংশ শতাব্দীর লেখা সেই আড়াই হাজার পৃষ্ঠার বইখানার পুরো বক্তব্যটাই শুনিয়ে দিল দুলাল দত্ত।

ভোটের দিন শ্রান্ত হ'য়ে শ্বেত-কুঠিতে ফিরে এল সে। সকাল আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ভোটের বাক্সে কাগজ ফেলবার সময়। একটা থেকে চারটে পর্যন্ত ভোট গণনা হবে। শ্বেত-কুঠির সামনে বিরাট বড় শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। ভোটের বাক্স সব দেশের চতুর্দিক থেকে এই শামিয়ানার তলায় এনে জড়ো করতে হবে। জনসাধারণের চোখের সামনে প্রতিটি বাক্স খোলার হুকুম দিয়েছে দুলাল।

গজানন মুখুজ্জে পুরোপুরি দুটো দিন ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইলেন। দুলালের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, চারটের সময় তিনি শামিয়ানার তলায় উপস্থিত থাকবেন। দুলাল ভাবল, হার-জিতের ওপর তো গজুদার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে না। হয় তিনি রাজা হ'য়ে বসবেন, নয় ম্যানেজিং ডিরেক্টার। রাজতন্ত্র জিতলে মাঝখান থেকে ওকেই শুধু বিংশ শতাব্দীতে নেমে যেতে হবে। ফিরে যাওয়ার কথাটা উল্লেখ না করলেও হত। কূটনীতির চাল দিতে গিয়ে ভুল ক'রে ফেলেছে। মাঝামাঝি রকমের একটা শর্ত খাড়া ক'রে দিলেই দু'দিকের সুখ-সুবিধা ভোগ করতে পারত সে। একে ক্লান্ত, তার ওপরে মনটা গেল খারাপ হ'য়ে। কে জানে, শিক্ষিত জনসাধারণ দুলালকে হয়তো পেছন থেকে ল্যাং মারবে। বক্তৃতা শুনে হাততালি দিল, কিন্তু ভোটের কাগজ হয়তো ফেলবে গিয়ে সদানন্দের বাক্সে। নাঃ, কিছুই আর ভালো লাগছে না। বিংশ শতাব্দীর ব্যর্থতার ছুঁচ এখানেও ফুটছে। এমত অবস্থায় প্রাইভেট সেক্রেটারির দরকার। লোপা দেবী কোথায় লুপ্ত হ'য়ে গেল? দশটা বেজে গিয়েছে, সে কেন এখনো এল না? চাকরিতে ইস্তফা

দিয়ে হয়তো হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে। কেন্দ্রীয় অফিসে টেলিফোন করল তুলাল। জিজ্ঞাসা করল, "লোপা কোথায়? হ্যাঁ, মিস্ মুদ্রাকে এক্ষুনি দরকার। কি বললেন? মদনকে শুশ্রূষা করছে? আচ্ছা, আচ্ছা—ধন্যবাদ।"

বসবার ঘরেই লোপামুদ্রার জন্য অপেক্ষা করছিল তুলাল। উত্তোলকে চেপে বসবার মতোও শক্তি নেই দেহে। ভোটের সভায় একটানা ষোলো ঘণ্টা চীৎকার করতে হয়েছে। কণ্ঠনালীর অবস্থাও শোচনীয়। টেলিফোনে কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছিল। জম্বুদ্বীপের শাসনভার নেয়ার ঝকমারি বড় কম নয়। মহানগরীর শোকসভা কোম্পানীর অফিস ছেড়ে গজুদা বাইশ হাজার মাইল ওপরে না এলেও পারতেন। সদানন্দের পাল্লায় প'ড়ে শেষ পযন্ত পটলীকে হয়তো জম্বুদ্বীপেই রেখে যেতে হবে। ড্রইং-রুমেব আবহাওয়া হতাশায় ঘন হ'য়ে আসতে লাগল। সদানন্দের হাতে পাটুলকে তুলে দিয়ে সারাজীবন একা একা শুধু সমাজতান্ত্রিক হ'য়ে সময় কাটাবে কি ক'রে তুলাল? মিস মুদ্রাও তো সহজে শিথিল হ'তে চাইছে না। শাড়ির বুননীতে ডি-সি কারেণ্ট! মাঝে মাঝে একটু ভাবপ্রবণ হওয়ার পর্যন্ত উপায় নেই। এর চেয়ে মহানগরীর অফিস কি ভালো ছিল না? সেখানে বিজ্ঞানের উন্নতি এতো বেশি হয় নি বটে, কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটারিদের সঙ্গে ভাবপ্রবণ হওয়ার কোনো বিঘ্ন নেই। ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

তার ওপর মদনের আবার অসুখ! ব্যাটা কাল থেকে জ্বালিয়ে মারছে। ভান করছে, না সত্যিই অসুখ কে জানে। মিস মুদ্রাকে সন্নিকটে পেয়ে বোধ হয় অসুখের ভান করছে। মদনকে বিশ্বাস নেই। মহানগবীর ছলাকলা সব চটপট শিখে ফেলেছিল। রেগে গেল তুলাল। শুকনো বালির মতো গলার ভেতরটা খরখর করছে। সারারাত বক্তৃতা দিয়ে এসে এখন হাতের কাছে প্রাইভেট

সেক্রেটারিকে পাওয়া যাচ্ছে না। কাল তো খুব লম্বা-চওড়া কথা বলেছিল, "আমি তো গণ্ডাবের প্রাইভেট সেক্রেটাবি না!" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তো দেখছি বাবা জগতের সবরকমের সেক্রেটারিকে হার মানালে। মদনের পাল্লায় লোপামুদ্রা পড়ল, না লোপার পাল্লায় মদন পড়ল স্বচক্ষে দেখবার জন্য দুলাল দত্ত অতিশয় ব্যস্ত হ'য়ে উঠল।

তেষ্টা পেয়েছিল খুব। হাতের কাছেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। লাল বঙের একটা বোতাম টিপে দিয়ে নলের মুখে গেলাস ঠেকিয়ে রাখল সে। নিজের মুখটাও সোজাসুজি ঠেকিয়ে রাখতে পারত, হাতে নিয়ে জল খাওয়ার প্রয়োজন হ'ত না। কিন্তু অভ্যাসের কুসংস্কার তো সহজে মবে না। বিংশ শতাব্দীর অভ্যাস এক-বিংশতেও বাঁচিয়ে রাখল দুলাল।

দরজার সামনে উত্তোলক উঠে এল। লোপামুদ্রা এসেছে। তাব শাড়িব দিকে দৃষ্টি দিতে ভয় পেল দুলাল। মেইন সুইচ বন্ধ না ক'বে সন্নিকটে যাওয়াও নিরাপদ নয়। দূরে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার বলো তো, মিস মুদ্রা?"

"মদনের অসুখ।"

"তুমি কি করছিলে?"

"শুশ্রূষা। প্রথমে তো ভয় পেয়ে মাথায় জলপটি দিয়েছিলুম। কিন্তু পরে বুঝলুম—"

হেসে ফেলল দুলাল। জম্বুদ্বীপের যুবতী নারী মদনের মাথায় জলপটি দিচ্ছিল!! হাসতে হাসতে সে জিজ্ঞাসা কবল, "পবে কি বুঝলে?"

মাথা নিচু ক'রে সলজ্জ ভঙ্গিতে লোপামুদ্রা জবাব দিল, "পরে বুঝলুম দু'দশ বালতি জল ঢাললেও মদনকে ঠাণ্ডা করা যাবে না।"

"সাত সমুদ্রের জল ঢাললেও আদি প্রকৃতি ঠাণ্ডা হয় না, লোপা দেবী।" দুলাল এগিয়ে গেল মিস মুদ্রার দিকে। দু'পা পেছনে

স'রে গিয়ে লোপামুদ্রা স্মরণ করিয়ে দিল, "আজ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির ভোল্‌টেজ বাড়ানো হয়েছে।"

"বেড়ে কতো হ'ল ?" দুলালের বেশ হাসিখুশি ভাব।

"চারশো চল্লিশ।"

"সত্যি কী অদ্ভুত দেশ তোমাদের, লোপা দেবী! সব কিছুই বিজ্ঞানসম্মত।"

দরজার সামনে দিয়ে একটা উত্তোলক উঠে গেল ওপর দিকে। কাল থেকে দুলালের মানসিক অশান্তি বেড়েছে। সদানন্দ যেন ওর ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তা সব নষ্ট ক'রে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করছে ব'লে সন্দেহ হ'ল দুলালের। এখন মনে হচ্ছে বই লিখে সময়ের অপব্যবহার না ক'রে মনোযোগ দিয়ে ব্যায়ামচর্চা করাই উচিত ছিল। জম্বুদ্বীপের রুচি মহানগরীর মতো নয়। পাটুল পর্যন্ত গুণ্ডাকৃতি সদানন্দের পঞ্চাশ ইঞ্চি বুকের ছাতির তারিফ করতে আরম্ভ করেছে! মহানগরীতে স্বাস্থ্যের অভাব থাকলেও রুচির অভাব পরিলক্ষিত হয় না।

দরজার বাইরে গিয়ে দুলাল ওপরের দিকে চেয়ে রইল মিনিট-খানেক। একটা শূন্য উত্তোলক নিচের দিকে নেমে আসছিল। বাইরে থেকেই সে জিজ্ঞাসা করল, "লোপা দেবী, ওপরে উঠল কে ? মনে হচ্ছে সদানন্দ ভট্‌চাজ গেল—"

"না—তিনি তো সকালবেলা তপোবন ত্যাগ করেন না। অন্য কেউ হবে। দেখুন মিস্টার দত্ত, আপনার একবার মদনের কাছে যাওয়া দরকার। আপনাকে দেখতে পেলে সে হয়তো একটু সুস্থ বোধ করবে।"

মিস মুদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে মদনকে দেখতে চলল দুলাল।

একষট্টিতম তলায় এসে মদনের চেহারা দেখে হাউ হাউ ক'রে কাঁদতে লাগল দুলাল। শরীরে যে কিছুই নেই! একটা রাত্রের মধ্যে তিন-চার মণ মাংস সব কোথায় গেল? গায়ের চামড়া

দু'দিকে ঝুলে পড়েছে। জলহীন ভিস্তির মশকের মতো পেটটা চ্যাপ্টা। হায়, হায়, হায়! মদনের গায়ের চামড়া মেঝেতে লোটাচ্ছে। চোখ-দুটো এতো তলায় তলিয়ে গিয়েছে যে, দূরবীন ছাড়া দেখতে পাওয়া অসম্ভব। ছটফট করতে লাগল দুলাল। মদনের চোখের ভাষা বোধহয় আধুনিক রাষ্ট্রভাষার মতো দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠল! এর পর তো আর কিছুই বোঝা যাবে না।

লোপামুদ্রা বলল, "জম্বুদ্বীপের হাওয়া ওর সহ্য হচ্ছে না। ওকে মহানগরীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করুন।"

"প্রধান চিকিৎসক পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন?" জিজ্ঞাসা করল দুলাল।

"চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা এতোক্ষণ পর্যন্ত তো শুধু পরীক্ষাই করলেন। কোনো অসুখ ওর নেই।"

"তাই হবে, তাই হবে—ওরে বাবা, সমাজতান্ত্রিক হাওয়া তোর সইবে না রে, মদন! মিস্ মুদ্রা, প্রহস্তনারায়ণবাবুকে এক্ষুনি একবার ডেকে পাঠাও। মহানগরীতে আজই ওকে ফেরত পাঠাতে হবে। ব্যাটা সারা দুনিয়ার লোক হাসালে!"

একটু বাদেই প্রহস্তনারায়ণ এসে পৌঁছলেন। মদনের চেহারা দেখে তিনিও বোকা ব'নে গেলেন! অসুখ নেই, অথচ দেহটা ওর শুকিয়ে আমসীর মতো হ'য়ে গিয়েছে। এমন অসম্ভব কাণ্ড স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হ'ত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিল গণ্ডারের বাচ্চা। জম্বুদ্বীপের পরিষ্কৃত এবং বীজাণুশূন্য হাওয়া টেনে টেনে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই গণ্ডারের চামড়া ঢিলে হ'য়ে গেল। ভয়ে এবং লজ্জায় প্রহস্ত-নারায়ণ মুহূর্ত কয়েক কথা বলতে পারলেন না। গোটা শ্বেত-কুঠিটার আবহাওয়া থমথম করছে। এমন ঘটনা জম্বুদ্বীপের ইতিহাসে কোনো দিনই ঘটে নি।

প্রহস্তনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করা যায় বলুন তো

দুলালবাবু? যা করবার এখুনি করতে হবে। দেরি করলে ওকে আর বাঁচানো যাবে না। শুধু চামড়াটাই প'ড়ে থাকবে।"

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে দুলাল বলল, "বিংশ শতাব্দীর হাওয়া না টানলে মদন বাঁচবে না--চামড়ারও বারোটা বেজে যাবে। প্রহস্তনারায়ণবাবু, রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করুন।"

"হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। মদন যদি মরে তা হ'লে দুঃখ আমরা পাবো—কিন্তু চামড়াটা যদি সেই সঙ্গে নষ্ট হ'য়ে যায় তা হ'লে বিংশ শতাব্দীটাই একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে ব'সে থাকবে। কী সাংঘাতিক ট্র্যাজিডি! যাই হোক, মদনের বিদায়-অভিনন্দনটা আমরা স্মরণীয় ক'রে রাখতে চাই। জম্বুদ্বীপের সবাই আসবে—সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানাবো আমরা।"

"আজ না ভোটগণনার দিন!" গণ্ডারের চামড়ায় হাত বুলতে বুলতে দুলালই বলল, "ফক্কড় আর কাকে বলে—একবিংশের আরাম বোধ হয় সহ্য হচ্ছে না লোকটার।"

"লোকটার? কার কথা বলছেন আপনি?" বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রহস্তনারায়ণ।

"সদানন্দের কথাই বলছি। তপোবন, রাজতন্ত্র এসব কথার অর্থ কি? এ কি মহানগরীর রকে ব'সে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে?"

"সেই ইস্যুতে আপনি নিজেই তো নির্বাচন চাইলেন। যাক গে সেসব কথা। ভোটগণনা শুরু হওয়ার আগেই মদনকে ফেরৎ পাঠাবার বন্দোবস্ত আমরা করছি। মদনের জন্য আমরা দুঃখিত—এবং লজ্জিত।"

সমস্তটা দুপুর শ্বেত-কুঠির দপ্তরে লোকের আর নিশ্বাস ফেলবার সময় রইল না। বিংশ শতাব্দীতে মদন আবার ফিরে যাচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় রকেট-জাহাজে একজন দায়িত্বশীল সামরিক কর্মচারীকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। দু'জন বড় বড় ডাক্তারও সঙ্গে থাকবেন। দুটি মেয়ে-নার্সেরও ব্যবস্থা রইল। গায়ের চামড়া

ঝুলে পড়েছে ব'লে রাষ্ট্রের সার্জেন-জেনারেল বললেন যে, অঙ্গ-সংবাহকও গুটি-ছুই সঙ্গে যাক। রকেট-জাহাজে উঠে ঘণ্টা-ছুই ম্যাসাজ করলে মদনের ঘুম আসতে পারে। ওর এখন নিদ্রার প্রয়োজন। অঙ্গ-সংবাহনের জন্য এক পিপে খাঁটি সরষের তেলের প্রয়োজন। সার্জেন-জেনারেল হুকুম করলেন সরষের তেল ছাড়া চলবে না। জম্বুদ্বীপে সরষের তেল কেউ ব্যবহার করে না। শ্বেত-কুঠির কর্মচারীরা বিপদে পড়লেন। কেউ কেউ প্রশ্নও করলেন : সার্জেন-জেনারেল কি জানেন না যে, তেল মাখাবার রীতি প্রায় একশো বছর আগেই উঠে গিয়েছে? জম্বুদ্বীপে কে কাকে তৈল মর্দন করে?

প্রশ্ন ক'রে লাভ হ'ল না কিছু। চতুর্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার। জবাব দিচ্ছেন না কেউ। কেন্দ্রীয় অফিস থেকে শুধু হুকুম আসছে। বিছানা-বালিশ, নানারকমের খাদ্য, বিশেষ ধরনের ইন্‌জেকশন, এমন কি গোটাকয়েক ট্র্যানকুইলাইজার বড়ি পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে হবে। এখন গোলমালের মধ্যে মাথা ঠিক রাখা অসম্ভব হ'য়ে পড়ল। মদনের গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'সে ছিল ছুলাল। কী আশ্চর্য মসৃণ ওর চামড়া! কতো কাণ্ড হ'য়ে গেল বিংশ শতাব্দীতে—ছু'ছুটো মহাযুদ্ধ, কাবণে এবং অকারণে কতো রক্ত-পাত, বর্ববোচিত সংঘটনের সংখ্যাও কম নয়, অথচ মদনের চামড়ায় একটি আঁচড় পর্যন্ত লাগে নি! গণ্ডারের চামড়া যে কি বস্তু তার অর্থ বুঝতে কষ্ট হ'ল না ছুলালের। শিক্ষা ও সভ্যতায় দীপ্তিশীল বিংশ শতাব্দীর গায়ের চামড়াও মদনের মতো মজবুত এবং আঁচড়-বিহীন।

লোপামুদ্রা অনেকক্ষণ থেকে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। ভিড় একটু ক'মে যেতেই সে এগিয়ে এল ছুলালের কাছে। জিজ্ঞাসা করল, "আমি একটু যাই না মদনের সঙ্গে?"

"কোথায়?" চমকে উঠল ছুলাল।

"মহানগরীতে। কতো রকমের কাহিনী শুনেছি—কিন্তু দেখবার সৌভাগ্য আমার কোনোদিনই হয় নি।" একটু থেমে লোপামুদ্রাই আবার বলল, "ভয়ের কোনো কারণ নেই, শাড়িটা আমি বদলে যাব।"

"অর্থনৈতিক বিভাগের অনুমতি নিতে হবে। একটা গণ্ডার পাঠাবার ব্যবস্থা যা হচ্ছে তাতে হয়তো বাজেটের টাকায় ঘাটতি পড়বে। তা ছাড়া বেড়াতে যাব বললেই তো ওঁরা তোমায় যেতে দেবেন না। কি হিসেবে যাবে ?"

"কেন, প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে।"

"কার ?"

"মদনের।"

প্রহস্তনারায়ণ ফিরে এলেন আবার। ব্যবস্থা সব হ'য়ে গিয়েছে। তিনি বললেন যে, সংবর্ধনার ঘটা দেখে খুশি হবে মদন। ভোটের বাক্সে কাগজ ফেলবার পর জম্বুদ্বীপের জনসাধারণ রাস্তার ছ'দিকে সারি দিয়ে দাঁড়াবে। রকেট-বন্দর পর্যন্ত এক ইঞ্চি জায়গাও আর ফাঁকা থাকবে না। মদনকে দেখবার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছে। গুজব রটেছে যে, পথের ধারে যে-সব বাড়ি আছে তার ছাদের ওপর দাঁড়াবার জন্য টিকিটও নাকি বিক্রি হ'তে আরম্ভ হয়েছে। মদন ধন্য।

একষট্টিতম তলায় ভিড় বাড়ছিল। শেষ দর্শনের জন্য দপ্তরের সবাই এসে উপস্থিত হ'ল এইখানে। মদন কিছুই বুঝতে পারল না। মেঝের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। রওনা হওয়ার মুহূর্তটা ঘনিয়ে আসছে। আদব-কায়দা বিভাগের বড়কর্তা মিস্টার নিরুপায় হালদার সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী। কারো যদি প্রেম, প্রীতি এবং প্রণয়জ্ঞাপনের ইচ্ছা থাকে তা হ'লে চটপট সেরে নিন।"

কান খাড়া করল মদন। বোধহয় দরকারী কথাগুলো কানে পৌঁছেছে ওর। দুলাল এবার প্রহস্তনারায়ণের কাছে গিয়ে বলল, "মদনের সঙ্গে মিস মুদ্রাও যাক না—কাছাকাছি একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি লেগে থাকা ভাল।"

"স্থানের সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। আমাদের যেটা সবচেয়ে বড় রকেট-জাহাজ সেটাই যাচ্ছে।"

দরজার সামনে উত্তোলক প্রস্তুত। জানলা দিয়ে দুলাল চেয়ে দেখল জম্বুদ্বীপের সেনাবাহিনীটি পথের দু'ধারে মোতায়েন হয়েছে। হাতে বন্দুক কারো নেই, কোমর থেকে ছোট ছোট শেকল ঝুলছে। শেকলের মুখে একটি ক'রে হাইড্রোজেন বোমা বাঁধা। দেখতে অনেকটা দেশলাই-এর বাক্সের মতো। প্রতিরক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টার জহ্লাদ প্রামাণিক এসেছেন। সৌজন্য এবং ভদ্রতা প্রকাশের জন্যই এসেছেন তিনি। নাভির তলা থেকে বুড়ো আঙুলের আগা পর্যন্ত পুরো অংশটাই অবশ।

উত্তোলকে ওঠানো হ'ল মদনকে। অতো ভারি ওজনের জানোয়ার, কিন্তু তুলতে মাত্র লোক লাগল দু'জন। প্রতিবাদের ভাষা কিংবা শক্তিও নেই ওর। দুলালের চোখ আবার ছলছল করতে লাগল। আদব-কায়দা বিভাগের বড়কর্তা শেষবারের মতো সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, "কারো কিছু বলবার থাকে তো এইবেলা ব'লে ফেলুন। উত্তোলক এবার নিচে নামবে।"

ওপর থেকে নিচে নেমে এল পাটুল দেবী। তার মুখেও ভাষা নেই। কচি কচি নটে-শাকের পাতা দিয়ে সে একটা অতিসুন্দর মালা তৈরি ক'রে এনেছে। মদনের গলায় পরিয়ে দিতে যাচ্ছিল এমন সময় নিরুপায় হালদার বললেন, "ওটা আমায় দিন, আমি পরিয়ে দিই।"

"কেন?" পাটুলের প্রশ্নে অভিমানের সুর।

"মদন যতো বড় স্বনামধন্য গণ্ডারই হোক না কেন, আসলে

তো জানোয়ার। আমাদের রাষ্ট্রাধিপতির কন্যা আপনি······তা ছাড়া এ তো ফুলের মালা নয়, এ হচ্ছে গিয়ে এক রকমের ঘাস।”

তুলাল ভেবেছিল প্রতিবাদ করবে। রাষ্ট্র-দপ্তরের আদব-কায়দা মানবে না। রাষ্ট্রাধিপতির হাত থেকে মালা পরার যোগ্যতা মদনের আছে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশ্নের খোঁচা লাগল ওর। জম্বুদ্বীপের মতো এমন একটা কংক্রিটের রাজ্যে নটে-শাক পেল কোথায় পটলী?

রকেট-বন্দরে পৌঁছে দেয়ার জন্য তুলাল আর সঙ্গে গেল না। এতো বড় বিরাট জনতার মধ্যে একটা মানুষের অনুপস্থিতি লক্ষ্যই করবে না মদন। তা ছাড়া নটে-শাকের রহস্যটা জানবার জন্য ওকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

বিদায়দৃশ্যটা অত্যন্ত করুণ হ'য়ে উঠল। নটে-শাকের স্পর্শ পেয়ে জিব বার কবল মদন। বোধহয় বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল ওর।

উত্তোলকটা একটু ন'ড়েচ'ড়ে উঠল। দেহ এবং মনের ষোলো-আনা সামর্থ্য দিয়ে মদন তার চোখ-তুটো ওপরের দিকে ঠেলে বার করবার চেষ্টা করছে। কি যেন বোঝাতে চায়, কি যেন প্রকাশ করতে চায় বিদায়-মুহূর্তে। বোঝাবার জন্য নতুন আঙ্গিকের আশ্রয় নিল বটে, কিন্তু পারলে না। হতাশ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল তুলাল। রুমাল উড়িয়ে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবার জন্য পকেটে হাত ঢোকালো সে। হতাশার মাত্রা চতুর্গুণ বেড়ে গেল। পকেটে রুমাল নেই! উত্তোলক নেমে যাচ্ছে, নিরুপায় হ'য়ে ধুতির প্রান্ত নাড়াতে লাগল সে।

মুহূর্তের মধ্যে একষট্টিতম তলায় বিরাজ করতে লাগল নিরেট নিস্তব্ধতা। মদনের সঙ্গে সঙ্গে জনতাও নেমে গিয়েছে নিচে। দাঁড়িয়ে রইল শুধু পাটুল আর তুলাল।

উত্তোলকটা অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই তুলাল জিজ্ঞাসা করল, “কি করবে এখন?”

"ওপরে যাব।"

"চলো না একই উত্তোলকে দু'জনায় পাশাপাশি ব'সে ওপরে উঠি?"

"না, দুলালবাবু। আমি একাই উঠব।"

"শোনো—" দুলাল পাটুল দেবীর পথ রুখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "একটা প্রশ্নের সত্যি জবাব দেবে?"

"বলুন।"

"এমন একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রে নটে-শাক পেলে কোথায়? কি, চুপ ক'রে রইলে যে?"

একটু ভেবে নিয়ে পাটুল জবাব দিল, "তপোবনে নটে-শাকের অভাব নেই।"

সকাল থেকেই ভোটের বাক্সে কাগজ ফেলা শুরু হ'য়ে গিয়েছিল। সন্ধে পাঁচটার সময় ভোট গণনা শেষ হবে। শ্বেত-কুঠির সামনে মস্ত বড় শামিয়ানা। ভোটের বাক্সগুলো সব এইখানে জড়ো করা হচ্ছে। মদন রওয়ানা হ'য়ে যাওয়ার পর জনতা সব ছুটে আসছে এই দিকে। জম্বুদ্বীপের অফিস আদালত সব বন্ধ আজ।

পাঁচটা প্রায় বাজে। শামিয়ানার তলায় জনসমুদ্র স্তব্ধ হ'য়ে আছে। গত একশো বছরের মধ্যে জম্বুদ্বীপের ইতিহাসে এতো বড় একটা কৌতুকাভিনয়ের সুযোগ আসে নি। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে জম্বুদ্বীপেরই অধিবাসী সদানন্দ ভট্চাজ। রাজতন্ত্র সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হবে কি না সে-সম্বন্ধে কৌতূহল কারো নেই, শুধু এর বৈচিত্র্যটুকুই উপভোগ করছে নাগরিকরা।

মিনিট দু'তিন আর বাকী। হাঁপাতে হাঁপাতে দুলাল এসে পৌঁছলো। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—তারপর আবার রাত্রি-জাগরণ। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো মদনের বিদায়-

সংবর্ধনার ঝুঁকিও নিতে হ'ল ওকে। এখন এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বের ফলাফলের ওপর বাকী স্বাস্থ্যটুকু নির্ভর করছে দুলালের। শামিয়ানায় তলায় ঢুকে গজানন মুখুজ্জেকে খুঁজতে লাগল সে। ব্যাপারটা কি? গজুদা এখানে উপস্থিত নেই কেন? সদানন্দ ভট্চাজই বা কোথায় গেল? পট্লীর উপস্থিতিও চোখে পড়ল না ওর।

হঠাৎ জনসমুদ্রের মধ্যে গুঞ্জনের বুদ্‌বুদ উঠল। শ্বেত-কুঠির বড় ফটকের দিকে দৃষ্টি ফেরালো দুলাল। গজুদা সভাস্থলে প্রবেশ করছেন। পট্লীও সঙ্গে আছে তাঁর।

ভোটগণনার দিকে আর কারো দৃষ্টি নেই। সবাই চেয়ে রয়েছে গজানন মুখুজ্জের দিকে। গজুদার চেহারাটাও মদনের মতো ভেঙে পড়েছে। গত দু' রাত্রি তিনিও বোধহয় ঘুমন নি। সাদা রঙের মধ্যে খানিকটা কালো মিশে গিয়েছে। চোখের তলায় কালি। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে গজুদা করছিলেন কি?

শতাব্দীর খবরের কাগজ কেটে কেটে তিনি একটি রাজমুকুট তৈরি করেছেন। অদ্ভুত ডিজাইন! ওপরের দিকটায় বাবলা-কাঁটার মতো অনেকগুলো চোখা চোখা মুখ। গজুদা তাঁর বাবরি চুলের ওপর কাগজের মুকুটটা প'রে এসেছেন। এমন সং সাজবার প্রয়োজন ছিল কি? সবিস্ময়ে দুলাল চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। মনে মনে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। গজুদা বোধহয় দুলালের পরাজয় কামনা করছেন। ফলাফল জানবার আগেই রাজা সেজে বসেছেন। পাগল আর কাকে বলে!

উঁকিঝুঁকি দিয়ে দুলাল এবার রাজতন্ত্রী সদানন্দ ভট্চাজকে খুঁজতে লাগল। মঞ্চের ওপর তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। সে কি তবে এখানে আসে নি? ভোটযুদ্ধ সে জিতবে মনে ক'রেই হয়তো তপোবনে ব'সে নটে-শাকের পাতা দিয়ে মালা গাঁথছে।

জনতার পেছন দিকে পুনরায় গুঞ্জন উঠল। সদানন্দ আসছে।

গরুর গাড়ি চেপেই সে এসেছে। নিজেই চালক। ভিড়ের পেছনদিকে গিয়ে দুলাল দেখল, জোয়ালের তলা থেকে গরু দুটোকে খুলে নিয়ে ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে বেঁধে রাখল। তারপর বস্তা থেকে বিচেলী বার ক'রে বিছিয়ে দিল গরু দুটোর মুখের সামনে। কাজের মধ্যে তাড়া নেই—কেমন যেন ধীরে ধীরে শ্লথগতিতে ঢিমে তালে কাজ ক'রে যাচ্ছে সে। গতিসর্বস্ব একবিংশ শতাব্দীর প্রতি এ ওর ইচ্ছাকৃত উপহাস ছাড়া আর কিছু নয়। পঞ্চাশ ইঞ্চি বপু দেখিয়ে দুলালের পঁচিশ ইঞ্চিকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতেও বাকী রাখে নি সদানন্দ। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি একটা পরেছে বটে, কিন্তু গায়ে কোনো জামা নেই।

সদানন্দ এগিয়ে আসতেই জনতা সসম্মানে দু'দিকে স'রে দাঁড়ালো। দুলাল দেখল, মাঝখানে মস্ত বড় একটা রাস্তা হ'য়ে গেল। সেই রাস্তা ধ'রে সদানন্দ চ'লে এল মঞ্চের কাছে। মঞ্চের ওপর তিনখানা চাঁপ-কাঠের চেয়ার। একটাতে গজুদা বসেছেন, অন্যটায় পটলী। তৃতীয়টা খালি ছিল। কিন্তু সদানন্দ মঞ্চের ওপর উঠল না, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল সে। অপেক্ষা করতে লাগল ভোটগণনার ফলাফল শোনবার জন্য।

উসখুস করতে লাগল দুলাল। ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে থাকার কোনো অর্থ হয় না। মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সবাই দেখুক ওকে, দেখুক রাজতন্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সে ভয় পায় না। বুকের মাপ পঁচিশ ইঞ্চি হ'লেও সে বাঙালী, সে ইন্‌টেলেকচুয়াল--সংস্কৃতি ওর আসল পুঁজি। সত্যি সত্যি দুলাল এসে সদানন্দের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাঁপ-কাঠের চেয়ারে ব'সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল পাটুল।

জনসমুদ্র স্তব্ধ হ'য়ে আছে। বিন্দুমাত্র আওয়াজ নেই। অধীর আগ্রহে সবাই চেয়ে রয়েছে নির্বাচন-পরিচালনা কমিটির প্রধান-কমিশনার মহম্মদ উজবুক খাঁ-এর দিকে। প্রত্যেকের মনেই কি

হয় কি হয় ভাব। রাজতন্ত্র, না সমাজতন্ত্র? সদানন্দ ভট্চাজ, না দুলাল দত্ত?

একটু হেসে সদানন্দ জিজ্ঞাসা করল, "কনুই দিয়ে গুঁতো মারছেন কেন? ব্যথা পাবেন যে—"

অপমানিত বোধ করা সত্ত্বেও দুলাল তার মনের উষ্মা দমন ক'রে রেখে বলল, "গুঁতো মারি নি। একটা কথা জানতে চাইছিলাম—"

"কি কথা?"

"তপোবন থেকে এখানে পৌঁছতে ক' শতাব্দী লাগল? মানে গ্যারেজ থেকে কখন এবং ক'টার সময় রওনা হয়েছেন?"

"রাজতন্ত্রের আগে জয় হোক, তারপর জবাব দেব।"

দুলালের এবার ভয় করতে লাগল। খাঁ-সাহেবের দিকে দৃষ্টি দিতেও ভয় করছে ওর। আর মাত্র গোটা-দুই বাক্স খুলে ফেললেই গণনা শেষ হ'য়ে যাবে। খালি বাক্সগুলো একদিকে স্তূপীকৃত হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। সেই স্তূপের দিকে চেয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল দুলাল। হেরে গেলে শুধু সাম্রাজ্যই হারাবে না, পটলীও হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। সারাটা জীবন বিরহানলে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরতে হবে। বই লিখে লিখেও এতো বড় আগুন নেবানো যাবে না। বিংশ শতাব্দীর শোকসভার ছায়া একবিংশের মাটিকেও স্পর্শ করল যেন।

খাঁ-সাহেবের হাতে একটি তালিকা মৃদু হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ভোটের সংখ্যা তালিকাতে লেখা হয়েছে। এবার তিনি এগিয়ে এলেন মঞ্চের দিকে। খবরের কাগজের বিশেষ বিশেষ সংবাদদাতারা পিছু ধরলেন তাঁর। গজানন মুখুজ্জে কিন্তু নির্বিকার। চোখ মুদ্রিত। দৃশ্য দেখে রাগ হ'ল দুলালের। মনে মনে গজুদা রাজা ব'নে গিয়েছেন। দাদা, ডিজাইন-ওয়ালা মুকুট পরলেই কি রাজা হওয়া যায়? দুলাল ভেবেছিল, কথাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে

ঘোষণা করবে। কিন্তু সাহস পেল না। কে জানে, জম্বুদ্বীপের জনসাধারণ হয়তো সত্যি সত্যি রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই চাচ্ছে।

মঞ্চের দিকে মুখ ক'রে খাঁ-সাহেব ঘোষণা করলেন, "রাজতন্ত্রের পরাজয় হয়েছে।"

চোখ খুললেন গজানন মুখুজ্জে। হাবার মতো শূন্যদৃষ্টিতে খাঁ-সাহেবের দিকে মুহূর্ত কয়েক চেয়ে রইলেন তিনি। চাঁপ-কাঠের চেয়ারটিকে সিংহাসন ব'লে আর মনে হচ্ছে না। উঠে দাঁড়ালেন মুখুজ্জে মশাই। হাঁটু দিয়ে চেয়ারের গায়ে ঈষৎ ধাক্কা মারতেই চেয়ারটা উল্টে প'ড়ে গেল মঞ্চের পেছন দিকে। পটলীও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। তার মনোভাবও বুঝতে পারল দুলাল।

ঘোষণা শুনে জনতা নীরব হ'য়ে ছিল। এদের মনোভাব কিছু বুঝতে পারছিল না দুলাল। সবাই চুপ মেবে গিয়েছে। গুঞ্জন নেই—এমন কি ফিসফিস ক'রেও কেউ কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছে না। জম্বুদ্বীপের অধিবাসীরা কি খুশী হয় নি? প্রহস্ত-নারায়ণ কোথায় গেলেন? এদিক-ওদিকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল দুলাল।

খাঁ-সাহেব চ'লে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এই সময় জনতা প্রশ্ন করল, "ক' ভোটে রাজতন্ত্রের পরাজয় হ'ল, সাহেব।"

প্রশ্ন শুনে মহম্মদ উজবুক খাঁ দাড়িতে হাত বুলতে লাগলেন। তারপর সোডার বোতলের ছিপি খোলার মতো ফুচ্ ক'রে একটা আওয়াজ হ'ল। খাঁ-সাহেবের হাসির আওয়াজ ওটা। তিনি বললেন, "সদানন্দ ভট্চাজ শুধু একটা ভোটই পেয়েছে!"

হাসির হুল্লোড়ে মেতে উঠল সারা জম্বুদ্বীপ। গজানন মুখুজ্জেও আর গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারলেন না। মুখের রেখাগুলো ভেঙে যেতে লাগল। প্রাণখোলা হাসির চিহ্নমাত্র নেই। হাসিটা বিকৃত রূপ ধারণ করল তাঁর। মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে হেলেদুলে হো

হো শব্দে হাসতে লাগলেন তিনি। শামিয়ানার তলায় প্রচণ্ড কলরব—প্রবল রগড়! বিদ্রূপের বাণে বিক্ষত হ'তে লাগল শুধু সদানন্দ ভট্‌চাজ।

গজাননবাবু হাসতে হাসতে প্রায় পাগল হ'য়ে উঠলেন। মঞ্চ থেকে নেমে পড়লেন। কাগজের মুকুটটা মাথা থেকে খুলে ফেলে ওপর দিকে ছুঁড়ে মারলেন, মাটিতে পড়তে দিলেন না। হাত দিয়ে লুফে নিয়ে কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন রাজমুকুট। জনতা তখন অবাক হ'য়ে গজাননবাবুকে দেখছে। হাসির মাত্রা অস্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল দুলালের। সে তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ কি করছ, গজুদা?"

"স'রে যা, স'রে যা—" কাগজের টুকরোগুলি মুঠো ক'রে তিনি সদানন্দের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুখ ভেংচে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে ছোকরা রাজতন্ত্রী, ক'টা ভোট পেলে?" টুকরো কাগজগুলো ছুঁড়ে মারলেন সদানন্দের মুখে। মুখ তুলল না সদানন্দ। নতমস্তকে অবিচলিতভাবে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেই একই জায়গায়।

ইশারাটা স্পষ্ট। জম্বুদ্বীপের ময়দান কংক্রিটের। ইটপাটকেল কিংবা সোডা-লেমোনেডের বোতল সেখানে নেই। বহু শতাব্দীর শূন্যতায় ভরা ভোটের বাক্সগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এল জম্বুদ্বীপের জনতা। দুমদাম ক'রে ছুঁড়ে মারতে লাগল সদানন্দের গায়ে। মদনের চামড়ায় ভোটের বাক্স দাগ কাটিতে পারত না, কিন্তু সদানন্দের বুক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। দুলাল লাফিয়ে উঠে পড়ল মঞ্চের ওপর। শান্ত হওয়ার জন্য জনতাকে অনুরোধ করতে লাগল। উচ্চৈঃস্বরে সে বলল, "অপোজিশনকে খুন করলে ডেমোক্রেসিকেও খুন করা হয়। বন্ধুগণ, আমরা জয়লাভ করেছি, সেইটাই তো রাজতন্ত্রীর যথাযোগ্য শাস্তি। দয়া ক'রে আর আপনারা ভোটের বাক্স ছুঁড়বেন না।"

দুলালের বক্তৃতা শুনে জনতা শান্ত হ'য়ে গেল। উত্তেজনার বাষ্প উবে গেল মুহূর্তের মধ্যে। পরিস্থিতি আয়ত্তে এসেছে। খাঁ-সাহেব ভিড়ের মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন, বেরুবার পথ পাননি। তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে দুলাল এবার জিজ্ঞাসা করল, "একটা ভোটই বা সদানন্দ পাবে কেন?"

"হ্যাঁ, সত্যিই তো একটা ভোটই বা সদানন্দ কেন পাবে?" প্রশ্ন করল জম্বুদ্বীপের সমগ্র জনতা। খাঁ-সাহেব জবাব দিলেন না, দাড়ির গুচ্ছ হাতের মুঠোতে ধ'রে রেখে নীরবতা রক্ষা করতে লাগলেন।

দুলালের মুখে হাসি নেই। প্রথম থেকেই সে গম্ভীর হ'য়েছিল। সমগ্র জনতা যখন হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিল তখনও গাম্ভীর্য ভঙ্গ হয় নি। বরং হাসির মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর গাম্ভীর্যের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছিল।

এখন সে খাঁ-সাহেবকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, "সদানন্দের বাক্সে একটা ভোটই বা দিল কে?"

ঘুরে দাঁড়িয়ে গজানন মুখুজ্জেও প্রশ্ন করলেন, "কে এই বিশ্বাস-ঘাতক? যে-দেশে শতকরা একশোজন লোকই শিক্ষিত সেখানে একজন বিশ্বাসঘাতকই বা থাকবে কেন?"

"কেন থাকবে?" গর্জন ক'রে উঠল সমগ্র জম্বুদ্বীপ।

"কী তার নাম?" জিজ্ঞাসা করলেন মুখুজ্জে মশাই।

"নাম বলুন, নাম বলুন।" দাবি করল ভোটদাতারা।

হাতজোড় ক'রে খাঁ-সাহেব বললেন, "ভোটদাতার নাম গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অসম্ভব।"

ছেলেছোকরার দল তবু সুর ক'রে দাবি জানাতে লাগল, "নাম বলুন, নাম বলুন। কে এই বিশ্বাসঘাতক?"

খাঁ-সাহেব জবাব দিলেন না বটে, কিন্তু সবাই দেখতে পেল মঞ্চের ওপর থেকে পাটল দেবী নেমে আসছে। দুই চোখ দিয়ে

তার জল গড়িয়ে পড়ছে। বিক্ষত সদানন্দের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। জম্বুদ্বীপের চোখের সামনে শাড়ির আঁচল দিয়ে সদানন্দের বুকের রক্ত মুছে দিতে লাগল পাটুল দেবী।

পঁচিশ ইঞ্চি চওড়া নিজের বুকের ওপর হাত বুলালো দুলাল। ব্যর্থতার খোঁচা লাগছে বুকে। এ ব্যর্থতা শুধু পটলী-কেন্দ্রিক নয়, এ ব্যর্থতা ইতিহাস-আশ্রিত। কোনো দিকেই আর সে দৃষ্টি দিল না, ধীরে ধীরে হেঁটে বেরিয়ে এল শামিয়ানার বাইরে। স্বপ্নের জগৎটাও ক্ষণস্থায়ী, ভেঙে পড়ল।

আঘাতটা বেশ জোরেই লাগল। লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরেছে কলকাতার সেপাই। ন'টা বেজে গিয়েছে। ময়দানে শুয়ে ঘুমবার অর্থ কি? চারদিকে মদের বোতলগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—খালি বোতল। কাঠের বাক্সটাতেও বোতলের সংখ্যা কম নয়। সেগুলো খরচ হয় নি। অতএব সেপাইটা লাঠি দিয়ে গুঁতো মেরেছে দুলালের মেরুদণ্ডে। পাশে শুয়ে ছিলেন গজাননবাবু। তাঁর তখনো ঘুম ভাঙে নি। তাঁকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দিয়ে দুলাল বলল, "এই ছাখো গজুদা, সেপাই ব্যাটা আমায় মারছে—শিগগীর উঠে পড়ো। তোমার সুপতিদাকে গিয়ে বলতে হবে—"

বাধা দিয়ে মুখুজ্জে মশাই বললেন, "থাম, থাম—এই তো জম্বুদ্বীপে গিয়ে ঝামেলা বাধিয়ে এলি। এখানে এসেও দেখছি পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া করছিস।"

"তুমি তো বলবেই এসব কথা। তোমাকে তো লাঠির গুঁতো খেতে হয় নি!"

"কি বললি, তোকে মেরেছে?" মুরুব্বী চালে মুখুজ্জে মশাই সেপাইটাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কেয়া কসুর সেপাইজী?"

এক বাক্স বিলেতী মদ চুরির অপরাধে সেপাই ওদের নিয়ে চলল থানায়। গ্ল্যাডস্টোন-ব্যাগটা সারারাত জলে ভিজে ভিজে

চুপসে গিয়েছে। সকালের রোদ্দুর লেগে সেটা এখনো শুকয় নি। নিজের হাতেই ব্যাগটা ঝুলিয়ে নিলেন গজাননবাবু। মদের বাক্সটা চাপিয়ে দিতে হ'ল দুলালের মাথায়।

সারারাত বৃষ্টির পর রৌদ্রের আলোয় কলকাতার ময়দানটা হাসিতে খুশিতে ঝলমল করছে। স্বপ্নেব ঘোর আব নেই। আন্দামান-গামী জাহাজটা এখনো লেগে রয়েছে আউটরামে ঘাটে। চতুর্দিকের পরিবেশে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখতে পেল না দুলাল। সারা পৃথিবীটাই আলোকিত মনে হচ্ছে। এমন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার পর মদের বাক্সটা মাথায় চাপিয়ে পথ চলতে ভালো লাগছিল না। ভেটারেন বিপ্লবী গজুদা সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও অসহায়তার ক্লান্তিতে দেহমন ছেয়ে গেল ওর। ময়দানটা পার হ'য়ে প্রকাশ্য দিবালোকে থানায় গিয়ে এখন পৌঁছতে হবে।

এসপ্লানেডের বিস্তৃত বুকের কাছে এসে পৌঁছবার আগে গজাননবাবু দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করলেন, "সেপাইজী, হাম্‌কো কেয়া কসুর?"

"তুম্‌লোগ বিলাইতী শরাব চুরি কিয়া।"

"চুরি কিয়া নেহি—"

"তব্ কেইসে মিলা?"

"রাস্তামে পায়া—"

হেসে উঠল সেপাইটা। আবও একটু এগিয়ে আসার পব সেপাইজী বলল, "তোম্‌কো ছোড় দেগা···মগব পাঁচঠো রুপেয়া—"

"রুপেয়া? আমার কাছে সাড়ে পাঁচ আনা আছে।"

তাড়াতাড়ি থানায় পৌঁছবার জন্যেই বোধহয় দুলাল পা চালিয়ে হাঁটছিল। পথের মাঝখানে গল্পগুজব ক'রে সময় নষ্ট করতে চায় না। স্বর্গ, নরক যেখানেই হোক পৌঁছনো দরকাব। আন্দামান থেকে ফিরে এসে এখন পর্যন্ত কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারেনি। অস্থায়ী ঠিকানা ওর আর পছন্দ হচ্ছে না।

রাজভবনের পুব দিক থেকে ছেলেছোকরার দল পিছু নিয়েছে ওদের। যতো এগুচ্ছে, ছোকরার দল ভারি হ'য়ে উঠছে। হাসি-ঠাট্টার তীর ছুঁড়ছে ওরা।

গন্তব্যে পৌঁছবার আগে শেষ চেষ্টা করল সেপাইজী। অনুনয়ের সুরে বলল সে, "দোঠো রুপেয়া দিজিয়ে—"

"সাড়ে পাঁচ আনাও দেব না।" জবাব দিল দুলাল।

আরও খানিকটা পথ এগিয়ে এসে গজাননবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে দুলাল, আঘাতটা খুব লেগেছে, না রে ?"

"কোন্ আঘাতের কথা জানতে চাইছ ? আঘাত তো একটা নয়, একাধিক।"

"আমি লাঠির আঘাতের কথা বলছি রে।"

"ও কি একটা আঘাত নাকি! তার চেয়েও বড় আঘাত পেয়েছি, গজুদা।"

"কোথায়, দেখি—" দেখবার জন্য থেমে গেলেন গজাননবাবু।

"সব আঘাত কি চোখে দেখা যায়—চলো, সময় নষ্ট ক'রো না।"

কি যেন ভাবলেন মুখুজ্জে মশাই। তারপর গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগটা দুলালের দিকে তুলে ধ'রে বললেন, "এটা তুই নে—মদের বাক্সটা আমার মাথায় চাপিয়ে দে, দুলু। ওটার ওজন তো কম নয়। দে —খুবই কষ্ট হচ্ছে তোর।"

"থাক। ওজন খুব বেশি নয়।" দুলালের মুখে মুমূর্ষু হাসি।

আজ রবিবার। রাস্তায় ভিড় নেই। এই অঞ্চলের দোকান-পাটও সব বন্ধ। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট ধ'রে ওরা এসে লালবাজারের সামনে পৌঁছল। গেটের বাইরে বে-সরকারী জনতা বাঁদর-নাচ দেখছিল। বিশ্রামের দিনে আমোদ আহ্লাদ করাই স্বাভাবিক। দুলাল বলল, "দেখেছ গজুদা, বাঁদর দুটো ভারতনাট্যম দেখাচ্ছে ?"

"তাই তো দেখছি। আঙুলের গাঁট ভেঙে ভেঙে মুদ্রা তৈরি করছে।"

"মুদ্রা? ও হ্যাঁ, মুদ্রাই তো। চলো, তাড়াতাড়ি এবার থানায় ঢুকে পড়ি।"

"হ্যাঁ, তাই চল—জামিন নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসব।"

"জামিন? অবাক করলে, গজুদা! বাইরে বেরিয়ে কি করবে?"

"বাঁদর-নাচ দেখব।"

ভেতরে ঢোকবার আগে দুলাল আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল সে, "একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি বর্ণাশ্রমধর্মে বিশ্বাস করো। বলো সত্যি কিনা?"

"এ কথা কেন বলছিস রে, দুলু? আমি যে বিপ্লবী সে কথা কি ভুলে গেলি?"

"সদানন্দের কথা মনে আছে কি তোমার, গজুদা?"

"সদানন্দ!"

"হ্যাঁ, সদানন্দ ভট্‌চাজ। সদানন্দ বামুন ব'লে তুমি ওকেই জামাই করতে চেয়েছিলে। ঠিক কিনা বলো?"

জবাব দিলেন না মুখুজ্জে মশাই। স্বপ্নের ষোলো আনাই বোধহয় মিথ্যে নয়। দুলাল মুহূর্ত-কয়েক চেয়ে রইল গজাননবাবুর আনত মুখের দিকে। কি যেন ভাবছেন তিনি, জবাব দিতে পারছেন না। বোধহয় বিপ্লবী-পিতা তাঁর নিজের মেয়েকে বিপ্লবীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান না। গজুদাকে বিব্রত করার আর কোনো অর্থ হয় না। তিনি ভেটারেন বিপ্লবী সে কথা সত্যি, কিন্তু সমাজ-সংসারের বাইরের মানুষ তিনি নন।

আর দেরি করল না দুলাল। অতীত ও বর্তমানের ব্যর্থতায় ভরা বিলেতী মদের বাক্সটা মাথায় নিয়ে বাংলার ছেলে ঢুকে পড়ল জীবনের লালবাজারে। থানায় যেতে আর ভয় নেই।

শতাব্দীর সেপাইটার মতো বর্তমানটাও ঘুষখোর।